ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের বই

ভারত

আজ ও আগামী কাল

জওহরলাল নেহরু

প্রকাশন বিভাগ

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্টের বই

ভারত
আজ ও আগামী কাল

জওহরলাল নেহরু

ঃ অনুবাদ ঃ

অরুণ মিত্র

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

জুন ১৯৬১ (আষাঢ় ১৮৮৩)
June 1961 (Asadh 1883)

By kind permission of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi and 'CHATURANGA', Calcutta, for permission to reproduce the translation which appeared in issue No. 1, Vol. XXI, Vaisakh-Asadh, 1366, B. S.

মূল্য ৭৫ ন. প.
Price : 75 nP

INDIA : TODAY AND TOMORROW
(*Bengali*)

ডিরেক্টর পাবলিকেশন্স ডিভিশন, ওল্ড সেক্রেটারিয়েট দিল্লী—৬
ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস, (পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ)
৩৮।এ, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত

শ্রীজওহরলাল নেহরুকে মৌলানা আজাদ বক্তৃতামালার উদ্বোধন-ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই শুভ অবসরে ভারতবর্ষের জীবন ও সাহিত্যে মৌলানা আজাদের বহুমুখী দানের উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি। অতি তরুণ বয়সেই তিনি প্রতিভাশালী লেখক ও ধর্মশাস্ত্রবিদ রূপে পরিচিতি লাভ করেন, কিন্তু যে গুণাবলীর জন্যে এই প্রতিষ্ঠা অর্জন সম্ভব হয়েছিল সেই গুণাবলীই তাঁকে নিছক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বেশীদিন আবদ্ধ থাকতে দেয়নি। অবাধ অনুসন্ধানের আগ্রহ এবং সত্যের অন্বেষণ তাঁকে অনিবার্যভাবে নিয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক আন্দোলনে, তাই কুড়ি বছর বয়সের পর থেকেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধা হন। তিনি তখনই উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বাধীনতার আবহাওয়া ব্যতীত মানুষের যথার্থ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। তাঁর বয়স যখন্ মাত্র পঁয়ত্রিশ তখন ভারতীয় জনসাধারণ তাঁকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত ক'রে সম্মানিত করে। পরে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সবচেয়ে সঙ্কটময় যুগে সুদীর্ঘ ছয় বছর তিনি কংগ্রেসের ভাগ্য পরিচালনা করেন। ১৯৪২ সালের সংগ্রামের সময় তিনি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন; স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্, লর্ড ওয়েভেল ও বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে স্বাধীনতা অর্জনের আলোচনার সময়ও তিনিই ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগই বিদ্যাব্রতী মৌলানাকে অকুতোভয় রাজনৈতিক যোদ্ধায় রূপান্তরিত করে। এই অনুরাগই তাঁকে ভারতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুক্তিবাদ ও প্রগতিবাদের অকুণ্ঠ সমর্থনে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং নীতি ও ধর্মের সমস্যা, সমস্তই এক অনাসক্ত অপক্ষপাত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবার চেষ্টা করতেন। স্বাধীনতা ও ন্যায় ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সেই স্বাধীনতা ও ন্যায়ের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি কর্মে অবতীর্ণ হন।

তাঁর চিত্তবৃত্তির দুটি প্রধান গুণ ছিল ঃ চিন্তার অসাধারণ স্বচ্ছতা এবং বিচারবুদ্ধির স্থৈর্য ও ভারসাম্য। তিনি সমস্ত গৌণ ও অবান্তর প্রশ্ন সরিয়ে যে কোনো সমস্যার মূল বিষয়ে সরাসরি পৌঁছতে পারতেন। মূল বিষয়কে নিষ্কাশিত ক'রে নেওয়ার এই অসামান্য ক্ষমতা তাঁর ঐকান্তিক ন্যায়বিচারবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। কোনো ব্যাপারেই তিনি তাই কখনো একদেশদর্শী মত অবলম্বন করেননি। যাঁরা ভিন্নমত হতেন তাঁদের মতকেও মর্যাদা দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর নিজের পছন্দ বা অপছন্দ তাঁর বিচারকে প্রভাবিত করত না বলা যায়। বুদ্ধিনির্ভর নিরাসক্তি এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে সমাদর করার এই ক্ষমতা ছিল ব'লেই তিনি যা কিছু বলতেন তার একটা বিশেষ গুরুত্ব থাকত।

মৌলানা আজাদ মূলত ছিলেন বিদ্যাব্রতী, ঘটনাচক্রই তাঁকে রাজনীতিতে টেনে আনে। তিনি যে ভাবে আত্মপ্রচার পরিহার করতেন তাতেই তাঁর ভিতরকার এই বিদ্যাব্রতী সত্তা পরিষ্কার টের পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র রাজনৈতিক নেতারা সাধারণত জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগে থেকেই শক্তি আহরণ করেন, কিন্তু মৌলানা আজাদ ছিলেন নিভৃতিপ্রিয় ; তিনি রাজনীতির রঙ্গভূমির চেয়ে তাঁর পাঠকক্ষের নির্জনতাই বেশী পছন্দ করতেন। নিজেকে তিনি জাহির করতেন না এবং হৈচৈ থেকে দূরে থাকতে চাইতেন—এই স্বভাবের জন্যে তিনি ভারতীয় জনসাধারণের কাছে আরও প্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জনসাধারণের শোক ও শ্রদ্ধার যে বিপুল প্রকাশ দেখা গিয়েছে তা একমাত্র গান্ধীজীর আত্মবলিদান ছাড়া আর কোনো উপলক্ষে দেখা যায়নি।

মৌলানা আজাদ "ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচার‍্যাল রিলেশন্‌স্"-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই এর সমস্ত কর্মোদ্যমের প্রেরণাদাতা ছিলেন তিনি। তাঁর স্মৃতির মর্যাদারক্ষার উদ্দেশ্যে কাউন্সিল "আজাদ স্মৃতি বক্তৃতা" নামে এক বক্তৃতামালা প্রবর্তনের এবং সেজন্যে ভারতের ও বিদেশের পণ্ডিতদের আমন্ত্রণের সিদ্ধান্ত করেছে। তাঁরা মনুষ্যজাতির মঙ্গল ও উন্নতির

কোনো সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন, তাতে ভারতবর্ষের বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ থাকবে। মৌলানা আজাদ ছিলেন মানবতাবাদী। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের প্রত্যেকটি দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল। কাউন্সিল আশা করে যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সদ্ভাব প্রসারে এবং আজ পৃথিবীতে যে-সব বিরোধ সঞ্চিত হয়েছে তার নিরসনে এই বক্তৃতামালা বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে শ্রীজওহরলাল নেহরু এই বক্তৃতামালার প্রথম ভাষণ দিতে সম্মত হয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ ও লেখক হিসেবে তিনি যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু তাঁর নিবিড় আন্তরিকতার উল্লেখ এখানে করতে চাই। চিন্তাবিদ, লেখক ও কর্মবীর হিসেবে এই আন্তরিকতাই বোধ হয় তাঁর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। নেহরু যা চিন্তা করেন তাই অনুভব করেন এবং অনুভব করার সঙ্গেই তা কার্যক্রমের মধ্যে রূপায়িত করতে চান। চিন্তা, অনুভূতি এবং কর্মক্রিয়ার এই নিবিড় যোগ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই যাঁদের মন অপেক্ষাকৃত মন্থর তাঁরা নেহরুর প্রতিক্রিয়ার ক্ষিপ্রতায় বিমূঢ় বোধ করেন, কখনো কখনো বিরক্তও বোধ করতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষিপ্রতা স্বচ্ছ আন্তরিকতারই বহিপ্রর্কাশ। সেখানে দ্বিতীয় দফায় চিন্তা করার স্থান নেই। পণ্ডিত নেহরুর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং প্রকাশ প্রায় সর্বদাই তাই যুগপৎ ঘটে।

আন্তরিকতা থেকেই ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা আসে। এটাই হল পণ্ডিত নেহরুর শক্তির এবং মনের স্থিতিস্থাপকতার রহস্য। বন্দীদশা সব সময়ই চরিত্রের একটা পরখ। যে শারীরিক কষ্টের সৃষ্টি হয় তার জন্যে ততটা নয়, যতটা মনের ভারসাম্যের উপর যে চাপ পড়ে তার জন্যে। স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে অপসারিত হ'য়ে, লোকজনের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে বন্দীদশায় মানুষ শুধু নিজের অনুভূতি, চিন্তা ও সঙ্কল্পের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে বাধ্য হয়। জোর ক'রে ঘটানো নিষ্ক্রিয়তা দেহ-মনের উপর ভীষণ এক ভার সৃষ্টি করে। যে মানুষ যত কর্মঠ ও জীবনীশক্তিসম্পন্ন তার উপর চাপটা সেই পরিমাণে

বেশী হয়। এই কারণেই জেলে থাকার সময় অনেক রাজনৈতিক নেতার মন ভেঙে না পড়লেও শরীর ভেঙে পড়ে। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু প্রায় অক্ষতভাবেই কারাজীবন অতিক্রম করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু এই কারণে যে তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে কল্পনা, চিন্তা ও সঙ্কল্পের সমাহার ঘটেছিল। যখন আন্দোলন বা কর্মের পথ তাঁর সামনে রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে তখনও কল্পনা তাঁর কাছে চিন্তা ও আবেগের জীবনকে সমপরিমাণেই বাস্তব ক'রে তুলেছে।

পণ্ডিত নেহরুর সমস্ত কর্ম ও উক্তি শিল্পীর অনুভব-প্রখরতায় চিহ্নিত। সকলেই জানে শিল্পীরা আত্মকেন্দ্রিক, সঙ্কোচ তাঁদের স্বভাবগত। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিপূরণের এক বিচিত্র নিয়মে তাঁরা তাঁদের চিন্তা ও আবেগকে জনসমক্ষে প্রদর্শন করতে ভালোবাসেন। বহির্জগতের অঙ্কুশে তাঁদের চিত্তে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাঁরা তা রঙে, রেখায় বা শব্দে প্রকাশ ক'রেই সাধারণত তুষ্ট থাকেন। কিন্তু কচিৎ কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া এত তীব্র হয় যে শুধু প্রকাশেই তাঁরা তুষ্ট থাকতে পারেন না। তাঁরা রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ ক'রে যে পরিপার্শ্বের মধ্যে তাঁদের জন্ম তাকে বদলাতে চান। শিল্পী তখন রাজনৈতিক যোদ্ধায় মিশে যান; কিন্তু তবু সংঘাত ও সংগ্রামের মধ্যেও তাঁর শিল্পী-সত্তা জেগে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্পীর শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত জওহরলাল নেহরু, এমন নিখুঁত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বেশী মিলবে না।

যেখানেই মহত্ত্বের বিকাশ সেখানেই তার ভিতরে স্ববিরোধের খানিকটা অবকাশ থাকে। পরস্পর-বিরোধী গুণের সংযোগের ফলেই প্রতিভার রূপ এমন সমৃদ্ধ ও জটিল। পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং শিল্পীসুলভ মেজাজ উভয়ই যে সমান প্রকট, তা মোটেই আশ্চর্যের নয়। মানুষ ও লোকব্যাপারের পর্যালোচনায় তিনি বরাবরই বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক ও অনাত্ম মনোভঙ্গী প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিচারশীল অনুসন্ধানী মনের জন্যে তাঁর পক্ষে একদেশদর্শী মতাবলম্বন কঠিন। এর ফলে অবশ্য তিনি কখনো কখনো কোনো কর্মপন্থা দৃঢ়ভাবে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতে ইতস্তত করেছেন, কিন্তু এর ফলেই

আবার তাঁর চিন্তায়, রচনায় ও কর্মে এক উদার ও অপ্রমত্ত দৃষ্টির ছাপ পড়েছে, যা বিজ্ঞানীর মৌল বৈশিষ্ট্য।

সময়ের অনিত্যতা ও ক্ষয়ের অনিবার্যতা আমাদের মনকে জীবন্ত সত্তার ধ্বংসচেতনায় পরিপূর্ণ করে। কোনো সংবেদনশীল হৃদয়ই এই অনুভূতি এড়াতে পারে না। কিন্তু বীর চিত্ত মানুষের মর্যাদার উপর জোর দিয়ে দুঃখ ও নিরাশাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। তিনিই মহৎ নেতা যিনি মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকায় ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু কোনো সময়ই সীমান্তপারের আলোকোজ্জ্বল শিখরকে বিস্মৃত হননি। যে-সব মূল্য রক্ষার জন্যে যন্ত্রণা ও মৃত্যুর সামনে শৌর্য, সাহস ও স্থৈর্যের প্রয়োজন, সেই সব মূল্য সম্বন্ধে চেতনা পণ্ডিত নেহরু আমাদের মধ্যে জাগ্রত করেন। তাঁর রচনা ও তাঁর কর্ম এই মনুষ্য-মর্যাদাবোধে পূর্ণ। এই স্বর্ণসূত্রই তাঁকে মৌলানা আজাদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ করেছিল এবং এর জন্যেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির উদার ও মানবিক রূপের সম্ভবত শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতীয় মানসের সারবস্তু ; কিন্তু তা অবশিষ্ট পৃথিবীর পক্ষেও সমান প্রযোজ্য, প্রকৃতপক্ষে সমান আবশ্যিক। এই কারণে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতকে পণ্ডিত নেহরু যেভাবে অবলোকন করছেন তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয়দের তিনি এক নব-জীবনের দাবী ও দায়িত্বের সম্মুখীন হতে আহ্বান করেছেন, তাই তারা যে এ ডাকে সাড়া দেবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু তাঁর আহ্বান কেবল তাদের জন্যে নয়, সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত সংবেদনশীল নরনারীর পক্ষেই তা সমান তাৎপর্যপূর্ণ।

আমি সানন্দে এবং সাগ্রহে শ্রীজওহরলাল নেহরুকে আজাদ স্মৃতি বক্তৃতামালার উদ্বোধন-ভাষণ দিতে অনুরোধ করছি।

হুমায়ুন কবির

নয়াদিল্লী
২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

প্রথমেই কৈফিয়ত দিয়ে শুরু করতে চাই। বহুকাল ধ'রে আমি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং প্রায়ই জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা দিয়ে থাকি, কিন্তু আজ যে ধরনের বক্তৃতা আমার দেবার কথা, তাতে আমি সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। এ ধরনের বক্তৃতা চিন্তাশীল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হওয়া উচিত, যথেষ্ট সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে তা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এ রকম ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতার অভাব তো আছেই; তা ছাড়া এখন পার্লামেণ্টের বাজেট-অধিবেশন চলছে। আমার দৈনন্দিন কাজকর্মও রয়েছে যার জন্যে অনেকখানি সময় ব্যয় করতে হয়। কাজেই আজকের এ অনুষ্ঠানের প্রতি আমি সুবিচার করতে পারিনি।

এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি ইতস্তত করেছিলাম, কিন্তু এক দুর্বল মুহূর্তে সম্মতি দিয়ে ফেলেছি। আজ মওলানা আজাদের মৃত্যু-বার্ষিকী। তাঁর স্মৃতি আমাদের কাছে প্রিয়। সেই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যেই এ দায়িত্ব আমি স্বীকার করেছি। তা ছাড়া, যে বিষয়ে বলবার জন্যে আমার কাছে প্রস্তাব করা হয় তাও আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কোনো না কোনোরূপে ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে। সেই সঙ্গে অবশ্য একটু আশঙ্কাও আমার হয়েছিল। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি বর্তমান ভারতবর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, ফলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমস্যার বিচার আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ধরনের বক্তৃতার এই আমার প্রথম প্রচেষ্টা; বিরাট কাজের চাপ এবং অন্যান্য অবস্থার টানাটানির মধ্যে এ বক্তৃতা আমায় তৈরী করতে হয়েছে। কাজেই শ্রোতাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

আজকের ভারতবর্ষকে বোঝবার এবং বর্ণনা করবার চেষ্টা করতে গেলে সাহস দরকার, আর আগামীকালের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে তো প্রায় হঠকারিতা করা হয়। ইতিহাসে আর কখনই একটি

দেশ বা বিশ্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা আজকের মতো কঠিন ছিল না। ঘটনা-প্রবাহ এখন অবিশ্বাস্য গতিতে ধাবমান, এক পরিবর্তনের পরেই আসছে আর এক পরিবর্তন। গভীরের অগণিত স্রোতকে রাজনীতির তুচ্ছ আবরণ আবৃত ক'রে রেখেছে, সেগুলি মাঝে মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সব কিছুর চেহারা ওলট পালট ক'রে দেয়।

আজকের ভারতবর্ষ শুধু অব্যবহিত অতীত থেকেই জন্মায়নি, হাজার হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে তার উদ্ভব। চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও কর্মের বহু স্তরের প্রভাব আমাদের উপর পড়েছে এবং তাই থেকেই আজ আমাদের এই পরিণতি। ভারতবর্ষে আমার যাঁরা সমকালীন তাঁরা এক ঘটনা-পরম্পরার প্রভাবে বিশেষভাবে গ'ড়ে উঠেছেন। সে সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। আমরা এক বিরাট পুরুষ এবং এক মহানায়কের সংস্পর্শে এসেছিলাম, যিনি আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে নাড়া দিয়েছেন, ওলট পালট ক'রে দিয়েছেন জীবনকে এবং চিরাচরিত জীবনযাত্রার গণ্ডী থেকে আমাদের টেনে বাইরে এনেছেন। শুধু তাই নয়, আমরা ইতিহাসের বিরাট গুরুত্বপুর্ণ কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি এবং তাতে অংশ নিয়েছি। সমস্ত সত্তা যখন উত্তেজনায় টানটান হয়ে ওঠে, আবেগে উদ্বেলিত হয় এমন অনেক মুহূর্ত আমরা বারম্বার আস্বাদ করেছি; কখনো কখনো তার প্রতিক্রিয়াও অনুভব করেছি ব্যর্থতায়; প্রায় হতাশার আস্বাদ পেয়েছি। অবশ্য এ অভিজ্ঞতার মধ্যে তফাৎ আছে, কারণ দারুণ স্নায়বিক উত্তেজনার পর সাধারণত মানসিক ও শারীরিক অবসাদের যে অনুভূতি আসে তা আমাদের স্পর্শ করেনি। আশা রাখার মতো একটা কিছু সব সময়েই আমাদের ছিল—ছিলেন পাহাড়ের মতো, অন্ধকারে দীপস্তম্ভের মতো একজন নেতা, ছিল একটি আন্দোলন যাতে আমরা রোমাঞ্চিত হতে পারতাম, যা আমাদের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অংশকে উৎসারিত করত। ঐ মুহূর্তগুলি সব সময় যে সুখের ছিল তা নয়, কখনো কখনো দুঃখেরই ছিল; কিন্তু একটা তৃপ্তির অনুভূতি সর্বদাই আমরা বোধ করেছি, জেনেছি যে আমরা বিরাট কোনো কর্মে নিযুক্ত রয়েছি, আমরা ইতিহাসের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছি। চিন্তা ও কর্মের মধ্যে

কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, তার ফলে এক পরিপূর্ণ জীবনানুভূতির সৃষ্টি হত। সব চাইতে এই একটি বিশ্বাস আমাদের বাঁচিয়েছিল যে রাজনীতির ব্যাপারেও আমরা নীতি মেনে মহৎ আদর্শ নিয়ে কাজ ক'রে চলেছি। বিরোধের ক্ষেত্রে, বিশেষত স্বাধীনতা সংগ্রামে, হিংসা মানুষকে যেমন গ্রাস করে, আমাদের তা করেনি।

আমাদের সামনে, আমাদের মনের মধ্যে গান্ধীজী সব সময়েই ছিলেন। অন্যেরাও ছিলেন, বিরাট সব মানুষ তাঁরা। আর ছিল অগণিত নরনারীর মধ্যে সখ্য। মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে এবং মহৎ এক নেতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ব'লে তাঁরাও চারিত্র্যে উন্নত হয়ে উঠেছিলেন। মওলানা আজাদ সেই সব বিরাট মানুষদের মধ্যে একজন ছিলেন ; বয়সে তখন তিনি নবীন কিন্তু সর্বদা তাঁকে আমরা জ্ঞানবৃদ্ধ, অভিজ্ঞ প্রবীণ ব'লে সম্মান করতাম। আমাদের আন্দোলনে তিনি এক বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে ছিলেন এবং অন্য যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে তিনিই ছিলেন আমাদের কাছে সেই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রতীক যে সমন্বয়ের প্রয়াস ভারতবর্ষ চিরকাল ক'রে এসেছে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের পথ থেকে তিনি আমাদের নিষ্ক্রান্ত হতে সাহায্য করেছিলেন, আমাদের দৃষ্টিকে তিনি প্রসারিত করেছিলেন। এতগুলি মানুষ যে নিজেদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য সত্ত্বেও এক নিবিড় ঐক্য আবিষ্কার করেছিলেন এবং পুরো এক যুগ ধ'রে একত্রে কাজ করতে পেরেছিলেন, এ এক আশ্চর্য ঘটনা।

২

ভারতবর্ষের স্বরূপ কী? এ প্রশ্ন বারবার আমার মনে জেগেছে এবং আমি আমার সাধারণ বুদ্ধিবিবেচনা অনুযায়ী ভারতের অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। আমাদের ইতিহাসের আদিযুগ আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। সে এক বলিষ্ঠ বীর্যবান জাতির অতীত ইতিহাস, যার মনে ছিল প্রখর জিজ্ঞাসা, অবাধ অনুসন্ধানের আগ্রহ এবং জ্ঞাত ইতিহাসের আদি পর্বেও যে জাতি এক পরিণত ও সহনশীল সভ্যতার চিহ্ন রেখে গেছে। জীবনকে

এবং জীবনের আনন্দ-বেদনাকে মেনে নিয়ে সে সর্বদা সন্ধান করছিল পরমের এবং বিশ্বজনীনের। সংস্কৃতের মতো অপূর্ব একটি ভাষা গ'ড়ে উঠেছিল তাদের হাতে। এই ভাষা এবং শিল্প ও স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে তারা তাদের প্রাণস্পন্দমান বাণী প্রেরণ করেছিল দূর দূরান্তর দেশে। এই জাতি জন্ম দিয়েছিল উপনিষদের, গীতার এবং বুদ্ধের।

একটা জাতির ইতিহাসে সংস্কৃতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পৃথিবীর আর কোনো ভাষা গ্রহণ করেছে কিনা সন্দেহ। সংস্কৃত যে শুধু উচ্চতম চিন্তার এবং উৎকৃষ্ট সাহিত্যের বাহন হয়েছিল তাই নয়, ভারতবর্ষের পক্ষে তা হয়ে দাঁড়ায় ঐক্যের সূত্র, যদিও রাজনৈতিক অনৈক্য যথেষ্ট ছিল। হাজার হাজার বছর ধ'রে রামায়ণ ও মহাভারত প্রতি যুগে কোটি কোটি মানুষের জীবন-ছন্দে গ্রথিত হয়ে গেছে। আমি অনেক সময় ভেবেছি, আমাদের জাতি যদি বুদ্ধকে এবং উপনিষদ ও মহাকাব্য-গুলিকে ভুলে যায় তাহলে তার কেমন রূপ হবে। তাহলে সে উন্মূল হয়ে পড়বে, যে-সব মৌল বৈশিষ্ট্য তাকে চিহ্নিত করেছে এবং যুগের পর যুগ তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে সেগুলি সে হারাবে। ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষ থাকবে না।

৩

ক্রমশ অধঃপতন শুরু হল। চিন্তা তার সজীবতা হারিয়ে স্বাদহীন হয়ে পড়ল, উচ্ছল ও প্রাণময় যৌবনের স্থলাভিষিক্ত হল কোপনস্বভাব বার্ধক্য। নিত্য নব অন্বেষার পরিবর্তে এল প্রাণহীন নিয়মচক্র। উদার প্রেরণাদায়ক বিশ্ববীক্ষা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে হারিয়ে গেল জাতিবর্ণভেদ ও সংকীর্ণ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে। তা সত্ত্বেও যথেষ্ট প্রাণশক্তি ভারতবর্ষের ছিল, যার ফলে সে তার বিশাল মানব-সাগরে সমাগত বিভিন্ন মানুষের ধারাকে আত্মসাৎ ক'রে নিতে পারল। উচ্ছল যৌবনের দিনে যে-সব চিন্তা তাকে নাড়া দিয়েছিল তা সে কখনো একেবারে ভুলে গেল না।

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ইসলাম এবং মুসলমান অভিযানের দ্বারা

প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। তারপর আসে পশ্চিমের ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গ। তারা নতুন এক আধিপত্য, নতুন এক উপনিবেশবাদ নিয়ে আসে এবং সেই সঙ্গে নিয়ে আসে নতুন চিন্তার ও ইয়োরোপে প্রসারশীল শ্রমশিল্প-সভ্যতার প্রভাব। দীর্ঘ সংগ্রামের পর এই অধ্যায় স্বাধীনতায় পরিণতি লাভ করে। এখন আমরা অতীতের এই সমগ্র ভার নিয়ে ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়েছি; যে ভবিষ্যৎকে আমরা গড়তে চাইছি তার এলোমেলো স্বপ্ন আর চাঞ্চল্য আমরা অনুভব করছি। আজ আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং আমাদের দেশের মধ্যে এই সব বিভিন্ন যুগই প্রতিফলিত। আধুনিক যুগের প্রতীক হল সংগঠিত শক্তি। পারমাণবিক বিজ্ঞান এবং পারমাণবিক শক্তি আমাদের ভারতবর্ষে অগ্রসর হচ্ছে, সেই সঙ্গে গোময়-যুগও এখানে রয়েছে। এইভাবে অতীতের প্রতিটি শতাব্দী আমাদের দেশে প্রতিফলিত। উপরন্তু রয়েছে এক বিশাল বৈচিত্র্য। তথাচ এ বৈচিত্র্যের পিছনে রয়েছে ঐক্য, যা আমাদের জনসাধারণকে নানা দুর্ভাগ্য ও দুর্বিপাক সত্ত্বেও যুগের পর যুগ একত্র ধ'রে রেখেছে। আমরা বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির জগতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি এবং প্রকৃতির শক্তিনিচয়কে যাতে আরো বেশী ক'রে কাজে লাগানো যায় তার জন্যে আমাদের জ্ঞানকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছি। শুধু যে দারিদ্র্য এবং অনুন্নত অবস্থাই আমাদের পিছনে টেনে রেখেছে তা নয়, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু সংস্কার এবং লোকাচারও বাধার সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজিকে বাদ দিয়ে আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি আমাদের অতীতকে উপেক্ষা করি বা বিস্মৃত হই, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ হবে শূন্যগর্ভ ও অগভীর, কোনো যথার্থ তাৎপর্য তার থাকবে না।

৪

বর্তমান যুগের হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমরা দুই দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি—ভবিষ্যতের দিকে এবং অতীতের দিকে। দুই দিকেই আমাদের সমান আকর্ষণ। কি ভাবে আমরা এই দ্বন্দ্বের

অবসান ঘটাব ? কি ভাবে জীবনকে গড়ব যাতে আমাদের বৈষয়িক প্রয়োজন মিটবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের হৃদয় ও মন সঞ্জীবিত থাকবে ? কোন্ নতুন আদর্শকে অথবা নতুন জগতের উপযোগী হতে পারে এমনভাবে পরিবর্তিত কোন্ পুরনো আদর্শকে আমরা জনসাধারণের সামনে ধরব ? কি ভাবে তাদের আমরা কর্মে ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করব ?

ভারতবর্ষে আমাদের নিজস্ব সব সমস্যা রয়েছে। কিন্তু জগতের বৃহৎ সমস্যাগুলিও আমাদের সমস্যা। এ জগৎ তার বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। ভারতবর্ষে আমরা বর্তমানে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপৃত আছি! জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্যে এক বিরাট প্রচেষ্টায় আমরা ব্যস্ত। অন্য যে কোনো অগ্রগতির পক্ষে এ প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। কিন্তু একটা সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হয়। শুধু এই যথেষ্ট, না, আরও কিছু করা প্রয়োজন ? কল্যাণ-রাষ্ট্র এক মহৎ আদর্শ, কিন্তু তা তো নীরস বিবর্ণও হতে পারে। যে সব রাষ্ট্র ঐ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে তারাও নতুন নতুন সমস্যা ও সঙ্কটে পীড়িত, যার সমাধান শুধু বৈষয়িক অগ্রগতি বা যান্ত্রিক সভ্যতা দ্বারা হয় না। মানব-প্রকৃতির কতকগুলি মৌল প্রয়োজন পূরণে ধর্মের এক প্রধান ভূমিকা ছিল। কিন্তু এই ধরনের ধর্মের প্রভাব আজ শিথিল হয়ে পড়েছে। তা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আঘাত প্রতিরোধ করতে পারছে না। ধর্ম প্রয়োজনীয় হোক বা না হোক, কোনো একটা মহান আদর্শে বিশ্বাস থাকা অত্যাবশ্যক। এ বিশ্বাস এমন হওয়া প্রয়োজন যা আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করবে এবং আমাদের একত্রে সংঘবদ্ধ রাখবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বৈষয়িক ও শারীরিক দাবীর উর্ধ্বে কোনো একটা উদ্দেশ্যবোধ আমাদের থাকা দরকার।

সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম এই উদ্দেশ্যবোধ দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তারাও যুক্তিনিরপেক্ষ অনড় মতামত প্রবর্তনের প্রবণতা দেখিয়েছে। কমিউনিস্টরা বর্তমান যুগের পরমার্থবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রত্যেক সমাজই একটা ভারসাম্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। কখনো তা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে, কখনো বা সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে

পূর্ব-সংকল্পিত অথবা অচেতন প্রয়াস দিয়ে। আদিম কোনো সমাজ বেশী বদলায় না, একটা বাঁধা রাস্তা ধ'রে চলে; এই কারণে একটা নীচু স্তরের ভারসাম্য তার থাকে। গতিশীল সমাজ আততি (tension) সৃষ্টি করে, যেমন ব্যষ্টির মধ্যে তেমন সমষ্টির মধ্যে। এ যদি সত্য হয় তাহলে পৃথিবীতে বর্তমানের সব আততি এক প্রচণ্ড গতিশীলতার দ্যোতক, মানব-অস্তিত্বে নতুন এক ভারসাম্য এবং নতুন এক বোধ (dimension) আনবার চেষ্টার পরিচায়ক। এতে আমাদের উৎসাহ বোধ করারই কথা; কিন্তু সব সময় মনে এই ভয় যে পারমাণবিক যুগের অস্ত্রসম্ভার সমগ্র মানব জাতিকে ধ্বংস ক'রে ফেলতে পারে।

ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে; বিশ্বাস ও উদ্যম নিয়ে সার্থক উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতের জন্যে কাজ করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের অতীত উত্তরাধিকারকে বজায় রাখতে হবে এবং তা থেকে বাঁচবার খোরাক আহরণ করতে হবে। পরিবর্তন প্রয়োজন, কিন্তু ধারাবাহিকতাও আবশ্যক। অতীত ও বর্তমানের ভিত্তির উপর ভবিষ্যৎকে গড়তে হবে। অতীতকে অস্বীকার করা এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হল নিজেদের উন্মূল ক'রে ফেলা, রসহীন বিশুষ্ক হয়ে যাওয়া। গান্ধীজীর গুণ ছিল এই যে, তিনি আমাদের দেশ ও জাতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে নিজেকে দৃঢ়নিবদ্ধ রাখতেন এবং সেই সঙ্গে বৈপ্লবিক স্তরে কাজ করতেন। অনেকে এই ব'লে তাঁর সমালোচনা করত যে তিনি সেকেলে অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করেছেন কিংবা এক ধরনের ঐতিহ্যবাদকে সমর্থন করছেন, এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে উৎসাহ দিচ্ছেন। কিন্তু তবু যদি কেউ তাঁর কার্যকলাপের বিশাল পরিধি বিবেচনা ক'রে দেখে তাহলে তাদের বৈপ্লবিক পরিণাম তাকে অভিভূত করবে। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর কার্যকলাপ দেখলে একথা বুঝতে অসুবিধে হয়, কারণ আমরা মানুষ হয়েছি সংঘাতের পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যে। তিনি জানতেন যে সত্যকার বিপ্লব জনসাধারণের মধ্যে থেকে আসে, উপর থেকে নয় এবং বিপ্লব মূলত সামাজিক। তাঁর আগে বহু বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারক এসেছিলেন, তাঁরা ছোটখাটো পরিবর্তন ঘটাতে বা নতুন সম্প্রদায় গড়তে পেরেছিলেন।

কিন্তু গান্ধীজী রামরাজ্যের কথা ব'লে লক্ষ লক্ষ গৃহে বিপ্লব আনেন, অথচ লোকে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি কি ঘটছে। তিনি বর্ণভেদকে কদাচিৎ নিন্দা করেছেন (যদিও শেষের দিকে কিছু করেন); কিন্তু অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে তিনি সমগ্র বর্ণাশ্রমকেই হীনবল ক'রে ফেলেন। পরিণাম জেনেই তিনি এরকম করেন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মরীতির দ্বারা তিনি কোটি কোটি লোককে সক্রিয় ক'রে তোলেন, তাদের মন থেকে ভয় দূর করেন এবং তাদের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা সঞ্চারিত করেন। সমাজে যারা সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত, যারা দারিদ্র্যপীড়িত, তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে তিনি আমাদের সামাজিক ন্যায়বিচারের দিক থেকে চিন্তা করতে বাধ্য করেন। এ সমস্তই তিনি শান্ত নিরুত্তেজভাবে করেন এবং বিরোধের মনোভাবকে বহুল পরিমাণে এড়িয়ে চলেন। সব চেয়ে বড় কথা, তিনি জোর দেন সত্য এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ের উপর। বস্তুত, সত্য তাঁর কাছে জীবনধারণের এক শর্ত হয়ে দাঁড়ায়; তাঁর প্রবল কর্মতৎপরতা সর্বদা সত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যে মূলনীতি অতীতে আমাদের জাতিকে উন্নত করেছিল তার স্মৃতি এই আচরণ দ্বারা তিনি জনসাধারণের মনে জাগ্রত করেন। এইভাবে প্রাচীন ভিত্তির উপরই তিনি নতুন সৌধকে ভবিষ্যৎমুখী ক'রে স্থাপন করেন। অর্থনীতি বা অন্য বিষয়ে তাঁর কোনো কোনো মত যে আধুনিক চিন্তার সঙ্গে খাপ খায় না বা তাদের তাৎপর্য যে নেহাৎ সাময়িক, এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। সব সময়েই তিনি পরিবর্তমান অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত থাকতেন, অবশ্য যদি না তার মূলে কোনো গলদ থাকত।

তিনি যে ভাবে অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে, এমনকি ভবিষ্যতের সঙ্গে গ্রথিত করতেন তা সব সময়েই আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে এবং তা করতে পারতেন ব'লেই তাঁর দেশবাসীকে তিনি এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সংঘাতকে বহুলাংশে পরিহার করতে সমর্থ হন। সব চেয়ে বড় যে শিক্ষা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন বা আমাদের স্মরণে এনেছেন তা হল উপায়ের গুরুত্ব। লক্ষ্য কখনই আপনাতে যথেষ্ট নয়, কারণ লক্ষ্য সাধনে যে উপায় অবলম্বন করা হয়

তার দ্বারাই লক্ষ্য বিশেষ রূপ পায়। এই নীতির মধ্যে এবং তাঁর কার্যপদ্ধতির মধ্যে যদি কোনো মূল সত্য থেকে থাকে তাহলে তাঁর স্থাপিত ভিত্তির উপরই আমাদের গ'ড়ে যেতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি যা কিছু ব'লে গেছেন বা ক'রে গেছেন আমরা তার দাসসুলভ অনুসরণ করব। আমাদের জীবনের একটা বিশেষ অধ্যায়ে হয়তো তা উপযোগী ছিল। কিন্তু আজ আর তা উপযোগী নয়। পরিবর্তমান অবস্থার সঙ্গে আমাদেরও নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে; কিন্তু আগের মতোই মূল নীতির দ্বারা আমাদের চালিত হতে হবে।

৫

রাজনৈতিক বিজয়ের রূপে ইসলাম যখন ভারতবর্ষে এল তখন নিয়ে এল সংঘাত। এর দুটো পরিণাম দেখা দিল। একদিকে, হিন্দু সমাজের গুটিয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে ইসলাম আরও বাড়িয়ে দিল; অন্যদিকে, এক ঝলক নতুন বাতাস ও নতুন চিন্তাধারা সে নিয়ে এল এবং তার ফলে এক যৌবন-সঞ্চারী প্রভাব বিস্তার করল। হিন্দু সমাজ এক অচলায়তনে পরিণত হয়েছিল। ভারতীয় চিন্তার আর এক বিরাট অবদান বৌদ্ধ ধর্ম থেকে এ বিষয়ে সে ছিল একেবারে আলাদা। বহিরাগত মুসলমানরাও নিজেদের অচলায়তন সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল। এইভাবে দুই অচলায়তন পরস্পরের সম্মুখীন হল—তারা একে অপরকে উচ্ছেদ বা দমন করবার মতো শক্তিশালী ছিল না। রাজনৈতিক জয়ের দ্বারা মানসিক, নৈতিক বা ধর্মীয় জয় এল না। নতুন প্রভাবকে প্রতিরোধ করবার মতো শক্তি ও দৃঢ়তা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে তখনও ছিল। মুসলমানরা আসে তাদের যৌবনদীপ্ত বাণী নিয়ে, কাজেই তাদের সহজে আত্মসাৎ করা গেল না, যেমন পূর্বেকার আগন্তুকদের করা গিয়েছিল। পক্ষান্তরে তারাও ভারতীয় জনসাধারণের মূল প্রকৃতিকে বদলাতে পারল না। এর ফলে মধ্যযুগে ভারতের সামনে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। সে সমস্যা হল, কিভাবে দুই দৃঢ়মূল অচলায়তন পরস্পরের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক গ'ড়ে তুলবে। আকবর এবং অন্য বিজ্ঞ

শাসকরা উপলব্ধি করেন যে ভবিষ্যতের একমাত্র আশা হল কোনো এক ধরনের একটা সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা।

প্রাচীন হিন্দুদের দর্শন ও বিশ্ববীক্ষা আশ্চর্যরকম সহনশীল ছিল; তবু তারা নিজেদের বহু বর্ণ-গোষ্ঠী ও শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল। মুসলমানদের এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়: কি ক'রে তারা অন্যদের সঙ্গে সমান হয়ে জীবন যাপন করবে? অন্য যে-সব দেশে তারা গিয়েছিল সেখানে তারা এমন বিপুল সাফল্যলাভ করেছিল যে এই সমস্যা দেখা দেয়নি। খ্রীষ্টীয় জগতের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল এবং শত শত বছরে এ সমস্যার কোনো মীমাংসা সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে এক সমন্বয় গ'ড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই অন্যান্য প্রভাব এসে দেখা দেয়। পাশ্চাত্য জাতিগুলি শ্রমশিল্প গ'ড়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা ভাবতে শিখল অন্যদের চেয়ে তারা শ্রেষ্ঠ। ফলে তারা পৃথক হয়ে বাস করতে থাকল এবং তাদের শাসনাধীন লোকদের অবজ্ঞা দেখাতে লাগল। ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের যে রকম বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়, সে রকম ব্যবধান হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কখনও ছিল না।

এই প্রথম ভারতবর্ষ দূর দেশ থেকে পরিচালিত ঔপনিবেশিক শাসন ও নিয়ন্ত্রণের অধীন হল। ইতিপূর্বে যে-সব আক্রমণকারী ও বিজেতা ভারতবর্ষে এসেছিল তারা ভারতবর্ষকেই নিজেদের বাসভূমি করেছিল, অন্যত্র তাকায়নি; মূলত তারা ভারতীয়ই হয়ে যায়। এবার হল এক নতুন ধরনের আক্রমণ, যা ভারতবর্ষে কোনো শিকড় গাড়তে পারল না। এদের এবং দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে, সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক বা অন্য কিছু হোক, এক অনতিক্রমনীয় প্রাচীর খাড়া হল।

তবু পশ্চিমের নতুন উদারনৈতিক চিন্তা এবং শিল্প-পদ্ধতি ভারতবর্ষের জীবন ও মনকে প্রভাবিত করতে আরম্ভ করল। এক নতুন জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হল। এ জাতীয়তাবাদ অপরিহার্যভাবে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা দাবী করল, অথচ সেই সঙ্গে পশ্চিমের নতুন শিল্প-সভ্যতা এবং পশ্চিমের ভাষা, সাহিত্য ও রীতিনীতির দ্বারা

ক্রমশ প্রভাবিত হতে থাকল। এ প্রভাব প্রধানত দেশবাসীর উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ হল, অধিকাংশ লোক গভীরতর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হতে লাগল।

রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল। তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আধুনিক ধারার মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করলেন। বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতের বলিষ্ঠ চিন্তার পুনরুদ্ধার করলেন এবং তাকে আধুনিক বেশ পরালেন। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গ'ড়ে উঠল এবং পরিণতি পেল গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথে।

ইয়োরোপে বিজ্ঞান ও সনাতন ধর্মের মধ্যে নিদারুণ সংঘাত বেধেছিল। খ্রীষ্ট ধর্মের ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে মোটেই খাপ খায়নি। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান সে সংঘর্ষের মনোভাব সৃষ্টি করেনি, ভারতীয় দর্শন নিজের মূল প্রত্যয়ের বিশেষ কোনো ক্ষতি না ঘটিয়েই তাকে সহজে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন আধুনিক ধারার সঙ্গে ক্রমেই বেশী পরিমাণে অসমঞ্জস হয়ে উঠতে থাকে।

অন্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও দুটি শক্তি বিকাশ লাভ করল— জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রেরণা। সমাজতন্ত্রবাদ এবং মার্ক্‌স্‌বাদ এই সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর কথা ছাড়াও জনগণের আবেগকে তারা প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। শ্রমশিল্প-বিস্তারের প্রথম আমলে পশ্চিম ইয়োরোপে যে মর্মান্তিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল, মার্ক্‌স্‌ মূলত তার জন্যেই বিচলিত হন। সে সময় রাষ্ট্রের কোনো সত্যকার গণতান্ত্রিক গঠন ছিল না এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কোনো পরিবর্তন আনা প্রায় অসম্ভব ছিল। সুতরাং বৈপ্লবিক হিংসাই ছিল পরিবর্তনের একমাত্র পথ। অতএব মার্ক্‌স্‌বাদ অপরিহার্যভাবে হিংস-বিপ্লবের কথাই ভাবল। তাছাড়া, ইয়োরোপের ঐতিহ্যেই এটা ছিল। তারপর অবশ্য রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিস্তারলাভ করেছে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির বিরাট অগ্রগতির ফলে বৈষয়িক সমৃদ্ধি সকলের নাগালের মধ্যে এসেছে। ধনতন্ত্রবাদের রূপও

অনেক বদলে গেছে, যদিও তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো এবং একচেটিয়া কারবার ও অর্থনৈতিক শক্তি সমাহারের প্রবণতা বজায় রয়েছে। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক গঠন, সংগঠিত শ্রমিক-শক্তি এবং সর্বোপরি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রেরণা এবং বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির অগ্রগতি এই রূপান্তর ঘটিয়েছে। আজ আমরা এমন সব ধনতান্ত্রিক দেশ দেখতে পাচ্ছি যারা জনসাধারণের জন্যে অতি উচ্চ জীবনযাত্রার মান প্রবর্তন করেছে।

আমরা এও দেখতে পাচ্ছি যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিপুলভাবে বেড়েছে এবং বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নলজি-সংক্রান্ত উন্নতিও হয়েছে অসাধারণ। এটা প্রধানত হিংসা দ্বারা সম্ভব হয়েছে বললে ঠিক হবে না। অন্যান্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থাতেও যথেষ্ট হিংসা ঘটেছে। তবে আমি মনে করি, এ কথা ঠিক যে অবস্থার কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নের উন্নতির সঙ্গে প্রচুর হিংসা ও উৎসাদন জড়িত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বড় নেতারা নিজেরাই এ হিংসার সব চেয়ে বেশী নিন্দা করেছেন।

৬

পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র এবং কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ আজ আন্তর্জাতিক ব্যাপারে প্রধান হয়ে উঠেছে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। স্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই বিরাট শক্তির মধ্যে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। তারা উভয়েই শ্রমশৈল্পিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার এক উচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছে; তারা উভয়েই যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে এবং তার মানব-সমস্যা সমাধান-ক্ষমতায় বিশ্বাসী। উভয় দেশের জনসাধারণই সহৃদয়, অতিথিবৎসল এবং শান্তি-অনুরাগী। আজকের আসল পার্থক্য উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে। শেষোক্ত দেশগুলির এই বোধ আজ হয়েছে যে একমাত্র বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশৈল্পিক উন্নয়ন দ্বারাই তাদের অগ্রগতি সম্ভব এবং তাদের দারুণ দুর্দশার অবসান সম্ভব। সেই

উদ্দেশ্যে তারা কাজ করছে এবং তাদের চেষ্টা অল্পবিস্তর সফল হচ্ছে। বড় কঠিন এ কাজ। ইয়োরোপে সত্যকার রাজনৈতিক বিপ্লবের আগে একটা অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটেছিল। যখন রাজনৈতিক বিপ্লব এল তখন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে কিছু সঙ্গতি তৈরী হয়েই ছিল। এশিয়ায় রাজনৈতিক বিপ্লব এল প্রথমে এবং তার ঠিক পরেই সামাজিক সুখসুবিধার জন্য দাবী উঠল। কিন্তু অনগ্রসর অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যে এবং সঙ্গতির অভাবে এ দাবী পূরণ করা সহজ ছিল না। যে সব দেশে আগে শ্রমশিল্প প্রসারলাভ করেছিল এবং যারা ব্যাপক উৎপাদনের ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলেছিল তাদের থেকে অনুন্নত দেশগুলির সমস্যা ছিল অন্যরকম। এ কথা স্পষ্ট যে ইয়োরোপ ও আমেরিকা যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া দ্বারা শ্রমশিল্প বিস্তৃত করে, অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে তা অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। এক সামাজিক চাপ নিরন্তর সক্রিয় ছিল; তা রাজনৈতিক সংগঠনকে বিপর্যস্ত ক'রে ফেলতে পারত যদি না জনসাধারণকে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করার মতো কিছু দেওয়া হত। তা ছাড়া ছিল দ্রুত-বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। যা কিছু বাড়তি উৎপাদন হচ্ছিল তা এই দ্রুত-বর্ধমান জনসংখ্যা শুষে নিচ্ছিল, পরবর্তী অগ্রগতির জন্যে সঞ্চয় বা বিনিয়োগের বিশেষ কোনো উপায় আর থাকছিল না। সুতরাং মূল সমস্যা দাঁড়ায় এই; অনুন্নত ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে বিনিয়োগ এবং অধিকতর উৎপাদনের জন্যে উদ্বৃত্ত কি ক'রে সৃষ্টি করা যায়? এ রকম যে কোনো চেষ্টার অর্থ জনগণের উপর আরও বোঝা চাপানো। অথচ এই জনগণই দাবী করছিল, তাদের বর্তমান বোঝা কমানো হোক।

বলপ্রয়োগের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেত। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, জনগণের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগও বেশী দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না যদি না তা ভবিষ্যতের আশার সঙ্গে যুক্ত হয়। সুতরাং মূলত দরকার কোনোভাবে অধিকতর প্রয়াসের অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং ভবিষ্যতের আশা জাগানোর মতো লক্ষ্য জনসাধারণের সামনে রাখা। সে ভবিষ্যৎ অতি দূরবর্তী হলেও চলে না। গণতান্ত্রিক সমাজে এই রকম আশা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ক'রে এবং অবস্থার ক্রমোন্নতি সাধন

ক'রে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন, তার উপরই সব কিছু নির্ভর করে।

অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষই বোধ হয় অধিকাংশ দেশের চেয়ে অগ্রসর। গত কয়েক বছরের মধ্যে শ্রম-শিল্পের ভিত্তি স্থাপনে, কৃষির উন্নয়নে এবং স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও শিক্ষার প্রসারে সুস্পষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, ভারতবর্ষ তার সার্থক জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের দ্বারা সংগঠিত লক্ষ্য ও আদর্শ এবং শৃঙ্খলার সুবিধা পেয়েছে।

জাতীয়তাবাদ এখনও এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ভাবধারা। জাতীয়তাবাদের প্রসার এশিয়ায় সুস্পষ্ট। ইয়োরোপেও তা ক্রমে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের সঙ্গে যুক্ত সেই ভয়ঙ্কর জাতীয়তাবাদ আমরা দেখেছি। সে বিপদ অবশ্য প্রতিহত হয়েছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুগ্র ধরনের এক আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ এখনও অনেক দেশের নীতিকে প্রভাবিত করছে। ইয়োরোপের অনেক দেশেই তা অল্প বা বেশী পরিমাণে প্রতীয়মান। ইয়োরোপে এই প্রবণতার পাশাপাশি রয়েছে জাতি-অতিক্রমী ঐক্যের অভিমুখী এক প্রবণতা। একটি সাধারণ বাজার এবং বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠান সংগঠনের চেষ্টায় এর প্রকাশ।

এমনকি কমিউনিস্ট দেশেও জাতীয়তাবাদ দেখা যাচ্ছে। মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তা এবং তার পরবর্তী বিভিন্ন রূপান্তর দ্বারা প্রভাবিত সোভিয়েট ইউনিয়নেও একটা শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী মনোভাব রয়েছে। পূর্ব-ইয়োরোপের অন্য দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের শক্তি প্রতীয়মান। এমনকি চীনেও সাম্যবাদ জাতীয়তাবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্যবাদ যেখানেই প্রবর্তিত হয়েছে সেখানেই তার শক্তির কারণ অংশত হল জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার সংযোগ। অনুন্নত ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে অসন্তোষের কথা বাদ দিলে বলা যায়, যেখানে এ দুই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, সেখানে সাম্যবাদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

যে সব দেশ এখনও বিদেশীর পদানত সেখানে জাতীয়তাবাদের প্রেরণাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের আকার নিচ্ছে। বিরোধীভাব দ্বারা

কিছুটা প্রতিহত হলেও স্বাধীন ও শক্তিশালী দেশে তা ক্ষমতা বিস্তারের দিকে ঝুঁকছে।

৭

সুতরাং একদিকে বৃহত্তর সংহতির মনোভাব, যেমন ইয়োরোপে ও অন্যত্র, এবং অন্যদিকে প্রাচীন জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রাতিগ শক্তি—এই দুয়ের মধ্যে এক বিরোধ আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির এবং বিশেষভাবে যোগাযোগ-ব্যবস্থার বিরাট উন্নতি ক্রমশই বৃহত্তর সংহতির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। এবং এটা ধ'রে নেওয়া যায় যে, অন্যান্য ব্যাপারের মতো এই ব্যাপারেও আধুনিক জীবনের মূল বাস্তব সত্যের প্রতিভূ বিজ্ঞানই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। আসল বিপদ জাতীয়তাবাদী সংঘাতের দিক থেকে, কারণ তা মহাযুদ্ধ নিয়ে আসতে পারে।

আজকের পৃথিবীতে প্রধান দুই মতাদর্শের মধ্যে ঠাণ্ডা-লড়াইয়ের ফলে এ রকম সংঘাতের সম্ভাবনা বেড়েছে। কিন্তু এই তথাকথিত মতাদর্শের সংঘাতের পিছনে রয়েছে প্রধান জাতিগুলির রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাদের একে অন্যের সম্বন্ধে ভীত। কমিউনিস্ট এবং অ-কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীতে ও অর্থনৈতিক মতবাদে এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য ইতিমধ্যে কিছু কমেছে এবং মনে হয় কমতেই থাকবে। উভয়ের মধ্যেকার ব্যবধান যতই গভীর ও বিস্তৃত হোক তা ক্রমেই হ্রাস পাবে। মানব জীবনকে মতাদর্শ ততটা বদলাচ্ছে না, কিন্তু বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির প্রসার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গঠনকে অবিরামভাবে রূপান্তরিত করছে। কার্য গঠনকে প্রভাবিত করে, স্থাপত্যে এটা সত্য। সমাজের গঠনেও শেষ পর্যন্ত এটা সমানভাবে সত্য। তার কাঠামো তার কার্যের অনুসারী। বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজি অবিরামভাবে কাজকে রূপান্তরিত করছে; সুতরাং সমাজের গঠনকেও এই সব নতুন কাজের ছাঁচের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে।

অতএব কোনো একটা বিশেষ মতাদর্শ নয় পরন্তু টেক্‌নলজির অগ্রগতিই হল আধুনিক জীবনের আসল বৈপ্লবিক ব্যাপার। টেক্‌নলজি-সংক্রান্ত পরিবর্তন যেখানে মন্থর সেখানে প্রাচীন গঠনগুলি বজায় আছে। অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশে পশ্চাৎপদ গঠন ও সমাজিক কাঠামো টিঁকে থাকছে, যার ফলে সে আধুনিক বিজ্ঞান-যুগের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য করতে পারছে না। কিন্তু জীবনের বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। পরিবর্তন আসবেই এবং তার সঙ্গে আসবে অন্যান্য পরিণাম। এই পরিবর্তন কখনো কখনো আকস্মিক ও বিপর্যয়কর হয়েছে ; কিন্তু অন্যরকমেও, যদিও আরও মন্থরভাবে, এই সব পরিবর্তন আসে।

গণতান্ত্রিক সমাজে, অর্থাৎ যেখানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এবং কোনো ধরনের এক পার্লামেণ্টারী শাসন বিদ্যমান সেখানে কার্যের পরিবর্তন, এমনকি কতকাংশে গঠনের পরিবর্তন ঘটাবার উপায় ও ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গঠন এবং কায়েমী স্বার্থ পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করে যতক্ষণ না অবস্থা গতিকে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। "প্রতিষ্ঠান" সর্বদাই যে কোনো পরিবর্তনের প্রতিরোধী, তা সে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক যাই হোক না কেন।

৮

বেঁচে থাকা হল পরিবর্তমান অবস্থার সঙ্গে ক্রমাগত খাপ খাইয়ে নেওয়া। প্রত্যেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক গঠনের একটা বিশেষ নিয়মানুবর্তিতা থাকে। ধর্মের নিয়মানুবর্তিতা আছে, সামাজিক প্রথার আছে। একটা নৈতিক বা মানসিক নিয়মানুবর্তিতা এর অন্তর্গত। কার্য এবং গঠন যখন বদলায় তখন পুরনো নিয়মানুবর্তিতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমে তার জায়গায় নতুন নিয়মানুবর্তিতা বলবৎ হয়। গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে টেক্‌নলজি-সংক্রান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে এবং সব সময়েই একটা অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে। প্রাচীন-কালে জীবন সরল ছিল এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার সংযোগ ছিল আরও

বেশী। কাজেই চিন্তা ও ধ্যানের সময় ছিল। এখন জীবন ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। শান্ত চিন্তা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। অবকাশ যদি মেলেও তবু সে অবকাশ নিয়ে আমরা কি করব জানি না।

অবকাশ ব্যবহারের এই সমস্যা উন্নত দেশগুলিতে ক্রমশই জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অবশ্য ভারতবর্ষকে এই সমস্যা বর্তমানে স্পর্শ করছে না এবং অদূর ভবিষ্যতে করবেও না। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত এবং যান্ত্রিক উপায়ের উপর ক্রমশ বেশী নির্ভরশীল জীবন তার আস্বাদ হারিয়ে ফেলতে আরম্ভ করে, এমনকি কর্মবৃত্তির বোধও তার আর থাকে না। নৈতিক ও মানসিক নিয়মানুবর্তিতা নষ্ট হয় এবং এক ধরনের মোহভঙ্গ আসে যার জন্যে মনে হতে থাকে আমাদের সভ্যতায় কোনো গলদ দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ ফিরে যেতে বলেন প্রকৃতির কাছে, প্রাচীন কালের সরল জীবনে। কিন্তু সে জীবনের যে গুণই থাক না কেন, ফিরে যাওয়া আর চলে না, কারণ পৃথিবী বদলে গেছে। ব্যক্তিবিশেষ হয়তো সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস অবলম্বন করতে পারে, কিন্তু সমগ্রভাবে সমাজ তা পারে না। জীবনের সমস্ত সমস্যা ও বিঘ্নবিপদ সমেত তারই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার সমাজকে করতে হয়, তা যদি সমাজ না করে তাহলে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।

বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই সম্ভব, বিশেষত পৃথিবী সর্বত্র সকলের জন্যে জীবনের মুখ্য প্রয়োজনগুলি পূরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব। এই অগ্রগতির কারণে উচ্চতর মান প্রবর্তনের এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানের পথ উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। আজ কল্যাণ-রাষ্ট্র, এমনকি শ্রেণীহীন সমাজ শুধু সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ নয়, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও তা মেনে নিচ্ছে, যদিও অগ্রসর হবার পথ উভয়ের পৃথক। অতএব মূল আদর্শগুলি পরস্পরের কাছাকাছি আসছে, এবং এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে যে পদ্ধতি পৃথক হলেও ঐ সব লক্ষ্যের নিকটবর্তী হওয়া যাবে। এই পদ্ধতিগুলি শুধু যে যুক্তিসঙ্গত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তা-ই নয়, তাদের নির্ভর করতে হবে দেশ বা জাতির ভৌগোলিক,

ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির উপর। সত্যকার কোনো পরিবর্তন সহজে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাকে উদ্গত হতে হয়। যে কোনো দেশের, বিশেষত যে দেশের সভ্যতা প্রাচীন তার শিকড় অতীতের গভীরে প্রসারিত; সে-সব শিকড় উপড়ে ফেললে সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, অবশ্য পুরনো অনিষ্টকর আচার ও বিধি-বিধানরূপী অনেক আগাছাকে উপড়ে ফেলা যায় এবং ফেলা উচিত। প্রকৃতি যেমন এক ধরনের ভারসাম্য স্থাপন করে যা হঠাৎ পাল্টে দিলে কুফল দেখা দেয়, তেমনি কোনো সমাজের বা দেশের বেলায় প্রাচীন রীতিনীতি হঠাৎ ওলট-পালট ক'রে দেওয়া সহজ নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কোনো সমস্যাকে এই ভাবে সমাধান করবার চেষ্টা করলে গুরুতর ও কঠিনতর সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

আমরা যে বহির্জগতে বাস করি তার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য, কিন্তু আরও অনেক বেশী প্রযোজ্য মানুষের অন্তর্জীবনের ক্ষেত্রে। সকলে জানে, উপজাতীয় এবং কথঞ্চিৎ আদিম সমাজে দ্রুত পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে গিয়ে বিপর্যয়কর ফল ঘটেছে। অধিকতর উন্নত সমাজ দ্রুত পরিবর্তনে ততটা ক্ষতিগ্রস্ত না হতে পারে, কিন্তু "জেট"-এর যুগে এবং মহাকাশ ভ্রমণের আগামী যুগে কি কি জৈব ও অন্য পরিবর্তন ঘটবে কেউ জানে না।

বাইরের ক্ষেত্রে যদি এই হয়, তাহলে মনে ও আবেগে নিশ্চয়ই আরও বড় পরিবর্তন ঘটবে। মানুষকে আজ তার কর্মতৎপরতায় ও বিধিব্যবস্থায় পরিবর্তনকে চিরসঙ্গী ক'রে বাস করতে হচ্ছে। মানব-ইতিহাসে এরকম কখনও হয়নি। বাস্তবিকপক্ষে, পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষ তাল রাখতে পারছে না, এবং যদিও বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির ফলকে সে কাজে লাগাচ্ছে তবু তাদের সঠিক বুঝতে পারছে না। শিক্ষার দ্বারা এক পরিপূর্ণ মানুষের বিকাশ ঘটানো হবে এবং সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের ও যৌথ জীবনে অংশ গ্রহণের উপযোগী ক'রে যুবকদের তৈরী করা হবে—শিক্ষার এই উদ্দেশ্য ধ'রে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমাজই যখন প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে তখন কি ভাবে তৈরী করা হবে এবং কোন্ লক্ষ্য ঠিক করা হবে তা বোঝা মুশকিল।

যন্ত্র সভ্যতা এবং সমাজ-জীবনের প্রাচীন গঠন ও তার দর্শন, এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব বিদ্যমান। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বদলাচ্ছে, এমনকি নিজের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গেই সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে। যান্ত্রিক সমাজে মানুষের ব্যক্তিসত্তার মূল্য ক'মে যাচ্ছে। ব্যক্তি জনতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে ; সমষ্টির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে নিরন্তর সচেষ্ট এক জটিল ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে সে নেহাৎ একটি যন্ত্রাংশে পরিণত হবার উপক্রম করেছে।

আমরা অনেকেই ব্যক্তির বিকাশ ও স্বাধীনতার উপর প্রচুর মূল্য আরোপ করি। মতাদর্শগত পটভূমি এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে বা বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু ব্যক্তি-সত্তার মূল্য যার দ্বারা বোধ হয় সব চেয়ে বেশী হ্রাস পায় তা হল যন্ত্রীকরণ ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ স্বয়ংক্রিয়া।

৯

আমরা টেক্‌নলজিগত এই সব দ্রুত পরিবর্তনের ফল দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ ক'রে বর্তমানের যুবক যুবতীদের মধ্যে। পরিণত বয়সীদের সঙ্গে যুব সম্প্রদায়ের পার্থক্য দেখে পিতামাতা, শিক্ষক এবং সমাজকর্মীরা ভাবিত। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা আচরণের যে ছক অনুসরণ ক'রে এসেছে তা আর গ্রাহ্য হচ্ছে না। প্রাচীন নৈতিক মান বর্জিত হচ্ছে। চরম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অপরাধ, পানাসক্তি, ধ্বংসাত্মক কাজ, কামচর্চার দিকে প্রবণতা এবং এর সঙ্গে রয়েছে জীবন ও কর্মের প্রতি এক অবজ্ঞাসূচক ও নেতিবাচক মনোভাব। যে জগতে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে এবং যেখানে কোনো আশ্বাস বা নিশ্চয়তা নেই, সে জগতে ইন্দ্রিয় সুখবাদী জীবন-নীতির আবেদন খুব প্রবল। ফলে জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বিপন্ন এবং সামাজিক ভাঙনের প্রবণতা প্রতীয়মান।

এটা হয়তো একটা চরম মত এবং বর্তমানের ঘটনার সঠিক পরিমাপ নয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই সব প্রবণতা রয়েছে, বিশেষ ক'রে সেই সব দেশে যে সব-দেশ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের চেয়ে উন্নত এবং অগ্রসর। এ সম্বন্ধে খুব অবহিত হওয়া দরকার,

কারণ এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে এই সব প্রবণতা আমাদের জীবনকেও প্রভাবিত করবে। হয়তো এসব প্রবণতা দ্রুত রূপান্তরের যুগের অপরিহার্য পরিণাম। হয়তো টেক্‌নলজির সঙ্গে সমঞ্জস এক নতুন সভ্যতার ভিত্তি ক্রমে স্থাপিত হবে এবং তার সঙ্গে বিকশিত হবে নতুন মতাদর্শ, যৌথ জীবনের নতুন গঠন এবং বিস্তৃততর এক জীবন-দর্শন।

যা ঘটছে সে সম্বন্ধে এ অভিমত অত্যন্ত নিরাশাবাদী ব'লে মনে করা হবে কিনা আমি জানি না। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমার নিজের প্রতিক্রিয়া নিরাশাবাদী নয়। একটা বিশ্বাস আমার মনকে ভবিষ্যতের আশায় পূর্ণ করে। এ বিশ্বাসের আমি ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে পারি না। প্রচুর সৌভাগ্য আমার জীবনকে বরাবর অভিষিক্ত করেছে ব'লেই হয়তো এমন হয়। আমার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য ভারতীয় জনসাধারণের বিপুল স্নেহ। কিন্তু আমি যখন বিদেশে গেছি তখনও সর্বত্র জনসাধারণের কাছ থেকে বন্ধুত্ব ও প্রাণস্পর্শী অভ্যর্থনা পেয়েছি। এইভাবে আমার হৃদয়ে আমার দেশের জনসাধারণের প্রতি এক গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বাস এবং অন্যান্য দেশের জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি সৃষ্টি হয়েছে। আমি উপলব্ধি করেছি, মানুষ যা দেয় তা পায়। যদি কেউ ভালোবাসা দেয় তাহলে তা প্রচুর পরিমাণে ফিরে পায়; যদি ঘৃণা দেয় তাহলে ঘৃণাই ফিরে পায়। আমি দেখেছি এবং অনুভব করেছি, জনসাধারণ সর্বত্র শান্তি, সদিচ্ছা ও সহযোগিতার জন্যে ব্যাকুল। এই যদি সত্য হয় (আমি সত্য ব'লে মনে করি) তাহলে ঘটনাস্রোতকে সংঘাত থেকে সহযোগিতায়, যুদ্ধের চিন্তা থেকে শান্তির কাজে ঘুরিয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হওয়া উচিত।

আমার মনে হয়, ভয়ই সম্ভবত সবচেয়ে বড় অমঙ্গল, কারণ ভয় থেকেই সংঘাত ও হিংসার জন্ম। হিংসা ভয়েরই প্রতিক্রিয়া, অসত্যও তা-ই। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে, সব চেয়ে বড় দান যা দেওয়া যায় তা হল 'অভয় দান'। যে ব্যক্তি ভয়মুক্ত সে সব কিছুকে ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পারে এবং মনে ও কাজে একটা পূর্ণতা বজায় রাখতে পারে। আজ আমরা দেখছি ভয় পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করছে, এমনকি সবচেয়ে বড় সবচেয়ে শক্তিশালী জাতিগুলিকেও ভয় চেপে

ধরছে। সম্পদ ও ক্ষমতা এই ভয়কে না কমিয়ে কার্যত আরও বাড়িয়ে তুলছে। সন্ন্যাসী ও অতিমানব ছাড়া কেউ সম্পূর্ণ ভয়হীন হতে পারে না। কিন্তু ভয়হীনতার আদর্শকে আমরা সামনে রাখতে পারি এবং তা সাধনের চেষ্টা করতে পারি। ভারতবর্ষে গান্ধীজীর সব চেয়ে বড় অবদান, তিনি আমাদের জনসাধারণের মধ্যে এই ভয়বোধকে কমিয়ে দিয়েছেন।

ভয়হীনতা থেকে আসে করুণা ও সহনশীলতা। আমরা যখন বুদ্ধের কথা ভাবি তখন তাঁর করুণা আমাদের অভিভূত করে; আমরা যখন অশোকের কথা ভাবি তখন তাঁর আশ্চর্য সহনশীলতা সংকীর্ণ বিশ্বাস থেকে আমাদের টেনে তোলে।

সংঘাতে পৃথিবী পূর্ণ—দেশীয়, অন্তর্দেশীয়, জাতি বর্ণ ধর্ম ও শ্রেণীর সংঘাতে। এ সংঘাতকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা হাস্যকর; কিন্তু আমরা সংঘাতের পরিবর্তে শান্তির পথে তাদের সমাধানে অগ্রসর হতে পারি।

১০

আন্তর্জাতিক দিক থেকে বিশ্বশান্তি আজকের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যে-সব বিরাট সমস্যা ও বিরোধে আমরা জর্জর তাদের সমাধান-চেষ্টা এর বিষয়। কি ক'রে সমাধান আসবে তার নির্দেশ আমি দিতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, সমাধানের উদ্দেশ্যে আমরা কোন্ উপায় অবলম্বন করব এবং কোন্ পথে চলব সে সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, দুটি জিনিসের মধ্যে একটিকে আজ আমাদের বেছে নিতে হবে—একদিকে যুদ্ধ, যার ফলে প্রায় পূর্ণ ধ্বংস এবং অন্যদিকে ঐ সব সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা। এ দুয়ের মধ্যে যদি নির্বাচন করতে হয় তাহলে কোন্‌টিকে নির্বাচন করা উচিত তা পরিষ্কার। এই নির্বাচনের পরবর্তী কর্তব্য হল বিশ্বের উত্তেজনা যা কিছুতে বাড়তে পারে তা পরিহার করা। যুদ্ধকে আজ বাতিল ক'রে দেওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত আমাদের গ্রহণ করতে হবে,

কারণ যুদ্ধ দ্বারা জয় বা জয়ের কোনো ফললাভের সম্ভাবনা নেই। অতএব সর্বদা যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার "উপক্রম নীতি" অনুসরণ করলে বুঝতে হবে বিজ্ঞতা লোপ পেয়েছে। অন্যের সঙ্গে যদি মতভেদ ঘটেও তবু ক্রুদ্ধ সমালোচনা ও নিন্দা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে; আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, কোনো একটা গোষ্ঠীর পক্ষে অর্ধেক পৃথিবীকে মন্দ বলা বা মন্দের করায়ত্ত বলা হাস্যকর। ধনতন্ত্রী বা সাম্যবাদীজগতের সমালোচনা করা সহজ; কিন্তু উভয়েরই মহৎ সব গুণ আছে, অনেক দোষ-ত্রুটি যদি থেকে থাকে তবুও। ভিতরকার বিরোধ সত্ত্বেও উভয়ে একই দিকে অগ্রসর হতে সচেষ্ট, এবং উভয়েই বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির অগ্রগতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের একমাত্র পথ হল বাস্তব পৃথিবীকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করা এবং পরস্পরের প্রতি আরও সহনশীল হওয়া। অতীতকালের ধর্মবিরোধ-সঞ্জাত সংঘর্ষ রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহের পর ক্রমে শেষ হয় এবং নতুন এক সহনশীলতা গ'ড়ে ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থ নৈতিক ও সামাজিক মতবাদের মধ্যেও সহনশীলতা গ'ড়ে না উঠবার কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর দ্বারাই উভয়ে প্রভাবিত হবে এবং তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। প্রত্যেক দেশেরই নিজের ভাবে নিজেকে গ'ড়ে তুলবার স্বাধীনতা থাকা উচিত। অন্যদের কাছ থেকে সে শিখবে, কিন্তু অন্যেরা তার উপর কিছু চাপিয়ে দেবে না। এইভাবে প্রত্যেক মতাদর্শ অন্যকে প্রভাবিত করবে এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হবে।

জাতীয়তাবাদ একটা জাতির পক্ষে সুস্থতারই পরিচায়ক, সুতরাং বাঞ্ছনীয়; দমিত হলে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হলে তা আক্রমণাত্মক ও রণলিপ্সু হয়ে ওঠে। আধুনিক জাতীয়তাবাদ বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিবাদেরই প্রতিক্রিয়া।

জাতিবাদ এখনও বিভিন্ন পরিমাণে বহু দেশে বিদ্যমান। কিন্তু সাধারণভাবে তা নিন্দিত। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন তাকে রাষ্ট্রীয় দর্শনরূপে গ্রহণ করেছে। এ যে সংঘাতের এক ভয়ঙ্কর

উৎস তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান। যেহেতু নিকৃষ্টতম আধিপত্য এর সারবস্তু সেই হেতু তিক্ততা ও তীব্র প্রতিক্রিয়া এ থেকে সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ বিরোধের সমাধান হিংসার পদ্ধতির উপর ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হতাশাকেই মেনে নেওয়া, তা ছাড়া হিংসার বিপর্যয়কর পরিণাম তো আছেই। অবশ্য এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, বিশ্বমত জাতিবাদের বিরুদ্ধে এমন কঠোর হয়ে উঠবে যে, কোনো দেশ বা গোষ্ঠী তা সমর্থন বা গ্রহণ করতে পারবে না।

যে রূপই নিক না কেন, সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ আজ পৃথিবীর অবস্থার সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং তা সংঘাতের এক উৎস। এখনও অনেক জায়গায় তার অস্তিত্ব রয়েছে এবং তার দর্শন অনেকের মনকেই প্রভাবিত করছে। কিন্তু বর্তমানে তা এক নিন্দিত মতবাদ এবং সর্বত্রই তা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত। অতএব বিশ্বনীতি বলতে বোঝায় সেই নীতি যা জাতিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাবে এবং সব দেশকে তাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে। কোনো কোনো দেশে হয়তো এর ফলে বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে; কিন্তু তা সীমাবদ্ধ থাকবে, বৃহত্তর অঞ্চলকে স্পর্শ করবে না এবং অল্পদিন পরে নিজের থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। এক দেশের পক্ষে অন্য দেশের উপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অন্যায়। তারই গতি আজ বিপজ্জনক পরিণামের দিকে।

অতীতে সামরিক জোট বা ঠাণ্ডা-লড়াইয়ের যে যৌক্তিকতাই থাকুক না কেন, আজ তা যুদ্ধের আশঙ্কা ও নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি করছে। সামরিক জোট আর ঠাণ্ডা-লড়াইয়ের জন্যে সব দেশেরই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ব্যাহত হয় এবং পৃথিবীর আবহাওয়া দূষিত হয়। যতদিন ঠাণ্ডা-লড়াই থাকবে ততদিন সহনশীলতা থাকবে না। অনুন্নত দেশগুলিকে অগ্রসর হতে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করার বদলে সামরিক বিবেচনাই এতে আসল হয়ে ওঠে এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও জনসাধারণের বিরাগভাজন রাজনৈতিক শাসনচক্রকে প্রায়ই সমর্থন দেওয়া হয়। তার ফলে নিরাপত্তা আরও বিঘ্নিত হয়।

পৃথিবীর দুঃখ দুর্দশা, বিরোধ ও বিক্ষোভ কোনো মন্ত্রবলে বা

সাধুবাক্যে অপসৃত করা যাবে, এ কথা বলা অবাস্তব। কিন্তু যার দ্বারা উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে, এমন কার্যক্রমের প্রস্তাব করা সম্পূর্ণ বাস্তব। মূলত এই কার্যক্রম হল এক নতুন মনোভঙ্গী, যার পিছনে পিছনে আসবে সমধারার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি। বহু-আলোচিত পঞ্চশীল বা পঞ্চসূত্র সেই মনোভঙ্গীকেই উপস্থিত করেছে। কিন্তু তা শুধু বাস্তব হতে পারে যদি মন ও হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে, শুধু অর্থহীন বাগাড়ম্বরে কোনো ফল হবে না। যুদ্ধ থেকে শারীরিক প্রতিনিবৃত্তিই শান্তি নয়, শান্তি হল সমগ্র বিশ্বে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

১১

ভারতবর্ষে আমরা এই নীতি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। অবশ্য তাতে যে আমরা সব সময়েই সফলকাম হয়েছি তা বলতে পারি না। বৈদেশিক নীতি শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও উন্নতির উপর নির্ভর করে। অতএব বিশ্ব-ব্যাপারে যদি আমাদের কোনো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমাদের পক্ষে অভ্যন্তরীণ অগ্রগতি একান্ত আবশ্যক। আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যে অবশ্য তা আরও বেশী আবশ্যক।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার দুই বছর শেষ হবার পর নানা দিকে আমাদের নিশ্চিত অগ্রগতি হয়েছে। কোনো কোনো দিকে তা সুস্পষ্ট, কোনো কোনো দিকে তা ততটা স্পষ্ট নয়। যত দ্রুত অগ্রগতি হলে আমরা খুশী হতাম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা হয় নি; কিন্তু এ কথা যেন স্মরণ রাখি যে অগ্রগতি যা হয়েছে তার পরিমাণ অল্প নয়। কৃষি ও শ্রমশিল্প, উভয় ক্ষেত্রেই এই অগ্রগতি স্পষ্ট, আর শেষ পর্যন্ত এর উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।

এই অগ্রগতির বনিয়াদ হল শিক্ষা। এখন বনিয়াদী শিক্ষা এবং টেক্‌নলজি-শিক্ষা, দুয়ের প্রতিই প্রচুর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুলে ও কলেজে পড়ছে, হাজার-হাজার ছেলেমেয়ে

বিশ্ববিদ্যালয় ও যন্ত্রশিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এ সংখ্যা ভারতবর্ষের জনসংখ্যার একটা অংশমাত্র, করবার অনেক কিছুই বাকী রয়েছে। তবু এ সংখ্যা বৃহৎ। এরা স্কুল কলেজ থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন নিয়ে আসে জীবন-নির্বাহের ব্যাপারে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। সুতরাং মন্থর কিন্তু অনিবার্যভাবে আমাদের সামাজিক ছাঁচ বদলে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় এবং বোধ হয় সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের দ্বারা। এই সব বালিকা এবং যুবতীরাই ভারতবাসীর সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করছে এবং তাকে ক্রমশ বেশী পরিমাণে বদলে দেবে। বর্তমানে এই সব পরিবর্তন গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরে ও নগরেই ঘটছে বেশী। কিন্তু আমাদের গ্রামকেও তা স্পর্শ করছে এবং আর কয়েক বছরের মধ্যে স্কুলে পড়ার বয়সের সব ছেলেমেয়েই বনিয়াদী শিক্ষা লাভ করবে।

আধুনিক শিক্ষার সমালোচনা ক'রে অনেক কথাই বলা হয়েছে। আমরা প্রায় সকলেই তার কোনো না কোনো দিকের সমালোচনা করেছি। তবু এই সত্যটা অস্বীকার করা যায় না যে শিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং আমাদের জীবন-বিন্যাসকে বদলে দিচ্ছে।

জনসংখ্যা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং এই বৃদ্ধির হার যদি বজায় থাকে তাহলে মনে হয় এই শতাব্দীর শেষাশেষি পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৩৫০ কোটি থেকে ৫০০ কোটির মধ্যে। ভারতবর্ষে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৬০ কোটি থেকে ৬৮ কোটি। আমরা যদি জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার খানিকটা রোধ করতে সমর্থ হই তাহলে ৬০ কোটি হল প্রত্যাশিত সর্বন্যূন সংখ্যা।

জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির দুটো দিক আছে। যে দিকটা নিয়ে আমাদের সব চেয়ে বেশী উৎকণ্ঠা তা হল এই যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক এবং যত অগ্রগতিই আমরা অন্যদিকে করি না কেন এই বৃদ্ধি আমাদের জীবনযাত্রার মান নীচুর দিকে টেনে রাখবে। আর একটা দিক হল, বিশ্ব-জনসংখ্যার এই বিপুল বৃদ্ধি বিশ্বের সমস্ত সঙ্গতি ও শ্রমশিল্প-উপকরণ দ্রুত উজাড় ক'রে দিচ্ছে।

এ বিষয়ে সারা দুনিয়া যদি আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো চলে তাহলে বোধ হয় এই শতাব্দীর শেষাশেষি পৃথিবীর সমস্ত আবশ্যকীয় উপকরণ শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য সে সম্ভাবনা কম। কিন্তু অন্যান্য দেশে দ্রব্য ব্যবহারের হার যদি অনেক কমও হয় তাহলেও আজ যে-সব উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে তা আর কয়েক শ বছরের বেশী থাকবে না।

সুতরাং এর দুটো পরিণাম দাঁড়াচ্ছে। একটা হল, জনবৃদ্ধির হার আমাদের রোধ করতে হবে; এবং অন্যটা হল, শক্তির অন্যান্য উৎস এবং উপকরণ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ভারতবর্ষে আমরা আমাদের স্বার্থের জন্যেই জনবৃদ্ধি-প্রতিরোধে উদগ্রীব। ব্যাপারটা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, জরুরীও।

১২

দুটো মূল সত্য আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রথম, বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির উন্নতির ফলে কতকগুলি জাতির উৎপাদন-ক্ষমতা এবং সম্পদ ও শক্তির বিপুল বৃদ্ধি। দ্বিতীয়, এই সব সম্পদশালী ও শক্তিশালী জাতির সঙ্গে অনুন্নত জাতিগুলির বিরাট প্রভেদ। এই প্রভেদ বেড়েই চলেছে এবং বস্তুত সাম্প্রতিক কালে অনুন্নত দেশে জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির চেষ্টা সত্ত্বেও এ পার্থক্য কমেনি। যদি স্বাভাবিক অর্থনৈতিক শক্তির এবং অন্যান্য শক্তির ক্রিয়া অবাধে চলতে দেওয়া হয় তাহলে ধনী জাতিগুলি আরও ধনী ও আরও ক্ষমতাশালী হবে এবং অন্যেরা নিছক প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই প্রাণপাত করতে থাকবে। যাদের আছে তারা আরও পাবে। এমনকি এক দেশের মধ্যেই দেখা যায় উন্নততর অঞ্চলগুলির অগ্রগতি অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশী।

এর ফলে জাতিতে জাতিতে সংঘাত ও যুদ্ধের বিপদ দেখা দেয় এবং অনুন্নত দেশে সমাজ-বিক্ষোভ বাড়ে। একদিকে ক্ষমতা ও সম্পদ থেকে আসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাত; অন্যদিকে দারিদ্র্য ও দুর্দশা সৃষ্টি করে সংঘাত ও বিপর্যয়। দুয়েরই পরিণাম দাঁড়ায় ভয় এবং নিরাপত্তার

অভাব। সম্পদ ও ক্ষমতা অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হলে নিরাপত্তা আসে না এবং পৃথিবীতে যে-সব শক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে তাদের ঠিকমতো বোঝবার সুযোগও পাওয়া যায় না। অতএব জাতিতে জাতিতেই হোক বা এক জাতির মধ্যেই হোক, এইসব প্রভেদ ও অসাম্য হ্রাস পাওয়া দরকার।

পারমাণবিক যুগের সমস্যা বিগতকালের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। কি রাজনীতিতে কি অর্থনীতিতে কোথাও এই সব সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভয় ও ঘৃণার সমস্ত উপচার নিয়ে ঠাণ্ডা-লড়াই চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখছি যে এ থেকে মানুষের বিপদই বাড়ে, কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। দেখছি, পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা যখন চালানো হচ্ছে তখন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এ রকম প্রত্যেকটি পরীক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। নৈতিক বিবেচনার কথা যদি নাও ধরা হয় তাহলেও এই সব নীতির কিছুমাত্র যৌক্তিকতা নেই। তবু কেন এই সব সেকেলে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে? আমরা আশা করব, সব রকম পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা বন্ধ করার জন্যে এবং অস্ত্রসজ্জা ক্রমে হ্রাস করার জন্যে অবিলম্বে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ভয়ের জন্যেই এ বিষয়ে একতরফা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, কিন্তু যুক্তি বিচারের ফলে দুতরফা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত; তাতে সব দেশেরই লাভ।

এই একই যুক্তি অর্থনৈতিক মতামত ও উপায়-চিন্তা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। যে জগতে ব্যাপক দারিদ্র্য রয়েছে এবং তারই পাশাপাশি রয়েছে অল্প কয়েকটি ঐশ্বর্যশালী ভাগ্যবান দেশ, সে জগতের অন্তর্নিহিত বিপদ যে কত বড় তা উপলব্ধি করা হচ্ছে না। অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যদি আশু প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে ধনী দেশগুলির পক্ষে আপন স্বার্থের দিক থেকেই সে প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা সমান প্রয়োজন। এসব সমস্যা এক নতুন জগতের; পুরনো জগতের পদ্ধতি দিয়ে তার সমাধান সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে সমাজ-প্রগতির সমূহ ক্ষতি ক'রে অস্ত্রসজ্জার জন্যে বিপুল অর্থব্যয় করা হচ্ছে, এ এক মর্মান্তিক ঘটনা। পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথ যখন খোলা রয়েছে তখন ভয় ও যুক্তিহীনতার আবহাওয়া যে বজায় থাকছে, তা আরও মর্মান্তিক। সামরিক উপায় দ্বারা বোঝাপড়া আসতে পারে না, তাতে শুধু আরও ভয় আর উত্তেজনারই সৃষ্টি হয়। আমি কোনো বিশেষ দেশকে দোষ দিচ্ছি না, কারণ সব দেশই কম বেশী এই ভয়ের আবহাওয়ার কবলে এবং তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে অসমর্থ। এখন আমাদের কর্তব্য অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই আবহাওয়া বদলাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে সব চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হত উৎপাদনের উপর (বস্তুত এখনও যথেষ্ট দেওয়া হয়)। তখন তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ক্রমেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল যে নিছক উৎপাদনেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না কিংবা সুখ ও তৃপ্তি আসে না। সম্পদ, সম্পত্তি এবং আরও বেশী অর্থের জন্যে তৃষ্ণা মানুষকে ক্রমে দূষিত করে এবং ঈর্ষা ও বিরোধ সৃষ্টি করে। যদি কোনো মানব-গোষ্ঠীতে বা সমগ্র পৃথিবীতে সামাজিক সমতা বিধান লক্ষ্য হয় তাহলে নিছক উৎপাদন দ্বারা তা সাধিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তা অধিকতর বৈষম্য সৃষ্টির দিকেই ঝোঁকে। এই কারণে ন্যায়সঙ্গত ধন-বণ্টন এবং উৎপন্ন বস্তুর যথোচিত ব্যবহারের সমস্যাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। মূলত, কি ভাবে জীবন কাটাব এবং কি ভাবে নিজের ও সকলের জীবনকে সার্থক করব, সেই জ্ঞান অর্জনই আসল প্রয়োজন। অর্থনৈতিক নীতিকে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা নৈতিক প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে প্রকৃতির নিয়ম-ব্যাখ্যার মতো আর দেখা চলে না।

১৩

বারবার আমি যে এই বৃহত্তর প্রশ্নগুলির উল্লেখ করলাম তার কারণ এগুলিকে আমরা এড়াতে পারি না। আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার উপর এগুলির প্রভাব রয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কারের

সঙ্গে আমরা এমন আবদ্ধ যে আমাদের সমস্যাগুলিকে বর্তমান পটভূমিতে বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। দারিদ্র্য এক অধঃপতন, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা স্বাভাবিক। দারিদ্র্যের মধ্যে স্বাধীনতার কথা বলা প্রায় পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার। সবচেয়ে মর্মান্তিক হল এই যে, দারিদ্র্য স্থায়ী হবার উপক্রম করে। আবার অন্যদিকে আজ দেখা যাচ্ছে, মাত্রাতিরিক্ত ধনসমৃদ্ধি, তা ব্যক্তিতেই হোক বা সমাজেই হোক, বহু অমঙ্গলের জন্ম দেয়। নিছক বৈষয়িক সম্পদের ক্রমাগত স্তূপীকরণ মানুষের অন্তর্জীবনে শূন্যতা নিয়ে আসতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক মনোভাব ও উপায়চিন্তা নিঃসন্দেহে অর্থনীতিমূলক, কিন্তু উপরের বিষয়গুলিও তার বিবেচনা থেকে বাদ পড়ে না। তবু এই বিপদ থেকে যায় যে সমৃদ্ধি এমনকি ন্যায়সঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থা স্থাপনে অগ্রসর হওয়ার পথে সমাজতন্ত্রবাদ হয়তো জীবনের কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে ধরতে পারবে না। এই কারণেই ব্যক্তির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে আজ আমাদের সমস্যা বিশেষ ক'রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার উচ্চতর মান প্রবর্তনের সমস্যা। ভেবে চিন্তেই আমরা সমাজের সমাজতান্ত্রিক গঠনকে আমাদের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছি, যদিও তার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আমরা দিইনি। আমি মনে করি, এ সব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়, কারণ তা যুক্তি-নিরপেক্ষ অনড় মত ও স্লোগানে পরিণত হতে চায়। সেটা এই দ্রুত পরিবর্তমান জগতে পরিষ্কার চিন্তার পরিপন্থী। কিন্তু খুব বেশী অস্পষ্টতাও ফলপ্রদ কার্যের পরিপন্থী। অতএব নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা দরকার এবং সেই লক্ষ্যে কি ভাবে পৌঁছনো যাবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আমি আগেই বলেছি, প্রত্যেক দেশের পক্ষে বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের উন্নতির পথে চলা আবশ্যক। সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু কোনো কিছু বাইরে থেকে চাপানো হলে সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হয় এবং বিরোধের সৃষ্টি হয়। অতএব প্রত্যেক দেশকে তার নিজস্ব নীতি প্রবর্তন করতে দেওয়া উচিত, যদি না তা অন্য দেশের ক্ষতি করে। এ কথা মানতে হবে আমরা কেউই

সত্যের একচেটিয়া মালিক নই এবং আমাদের পক্ষে যা উপযোগী তা ভিন্ন অবস্থার কারণে অন্যের পক্ষে উপযোগী নাও হতে পারে। আমাদের এও মেনে নেওয়া দরকার যে আমরা পছন্দ করি না এমন অনেক কিছুর সঙ্গেই একত্রে এই পৃথিবীতে আমাদের বাস করতে হবে। একমাত্র যে প্রভাব প্রয়োগ করা উচিত তা হল আচরণ ও নীতির প্রভাব, অন্যদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার প্রভাব। প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শের মধ্যে আজ বিরাট বিভেদ থাকা সত্ত্বেও আমি মনে করি সাদৃশ্যের ক্ষেত্র বাড়ছে এবং বাস্তব অবস্থা তাদের পরস্পরকে কাছে নিয়ে আসছে। যদি ভয় সেখানে না থাকে এবং হুমকি ও জবরদস্তি প্রয়োগ না করা হয় তাহলে এই কাছে-আসাটা ত্বরান্বিত হবে। মোটামুটি বলতে গেলে এর অর্থ এই যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক জাতি ও অন্য জাতির মধ্যে স্থিতাবস্থা মেনে নিতে হবে। যে সব সমস্যার সমাধান আবশ্যক, শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একটা জাতির ভিতরেও বিরোধ আছে। তবে একটা পার্থক্য আছে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-সম্বলিত গণতান্ত্রিক সংগঠনে ঐ সব বিরোধ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাধান করা যায়। সাধারণত ধর্মীয় বিরোধ এখন ঘটে না। জাতিগত বিরোধ পৃথিবীর অল্প কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, যদিও জাতি-সমস্যা টিকে রয়েছে। প্রদেশ ও ভাষার ভিত্তিতে বিরোধের শোচনীয় দৃশ্য ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি। তবে সমস্যার উদ্ভব আজ প্রধানত শ্রেণী-স্বার্থের সংঘাত থেকে এবং এই সব ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থকে হটানো সহজ নয়। তবু আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষে বহুকালের রাজন্য, জায়গীরদার, তালুকদার ও জমিদারদের মতো কায়েমী স্বার্থের সমাধান শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতেই করা হয়েছে। এর দ্বারা সুবিধাভোগী স্বল্পসংখ্যের অনুকূল এক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো হয়। শ্রেণী-বিরোধ যে আছে সে কথা আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করব ; কিন্তু এই রকম শান্তিপূর্ণ উপায়ে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন না করার কোনো কারণ নেই। এই সব পদ্ধতি সফল হবে একমাত্র যদি ঠিক লক্ষ্য আমরা সামনে রাখি এবং জনসাধারণ সে লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বোঝে।

১৪

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, আহরণশীল সমাজ ধনতন্ত্রের ভিত্তি, কিন্তু এখন তা আর বর্তমান যুগের উপযোগী নয়। আগেকার কালে হয়তো উপযোগী ছিল। নিঃসন্দেহে ধনতন্ত্র অনেক বড় কাজ করেছে, কিন্তু আজকের পৃথিবী সে অধ্যায়কে অতিক্রম ক'রে গেছে। আজকের পৃথিবী অত্যন্ত জটিল ও জনাকীর্ণ। আমরা পরস্পরের প্রায় দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট। এমন এক উন্নততর ব্যবস্থা আমাদের সংগঠন করতে হবে যা আধুনিক অবস্থা ও মানসের সঙ্গে অধিকতর সমঞ্জস এবং যে ব্যবস্থার মধ্যে এত বেশী প্রতিযোগিতা থাকবে না, থাকবে অনেক বেশী সহযোগিতা। এ থেকেই আসবে বিশ্বরাষ্ট্র এবং তা শুধু সম্ভব এক স্বাধীন আবহাওয়ায়, যখন প্রত্যেকটি জাতীয় গোষ্ঠী অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না ক'রে নিজের ধ্যানধারণা অনুসারে অগ্রসর হবে।

দেখা যাচ্ছে, মুনাফা-প্রেরণার উপর প্রতিষ্ঠিত আহরণশীল সমাজ এই নতুন জগতের উপযোগী নয়; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোনো উদ্যম বা অনুপ্রেরণা আর থাকবে না। অনুপ্রেরণা সব সময়েই দরকার হবে, তবে আর্থিক লাভে তা সীমাবদ্ধ না হতে পারে। জীবনকে গভীর-ভাবে সার্থকভাবে পেতে হলে আমাদের দুঃসাহসী হতে হবে, অনুসন্ধিৎসু হতে হবে এবং বিপদ এড়িয়ে চলবার মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের ক্ষেত্র তখনও বিস্তৃত থাকবে, কিন্তু নিছক আহরণের প্রবৃত্তি ত্যাগ ক'রে তাকে অন্যভাবে কাজ করতে হবে। ভারতবর্ষে আমরা বেশ দেরীতেই শিল্প-বিপ্লবের অধ্যায়ে পা দিয়েছি। পা দিয়েছি এমন সময়ে যখন পৃথিবীর কোনো কোনো অংশ জেট ও পরমাণুর যুগে পৌঁচেছে। সুতরাং আমাদের একই সময়ে এই দুই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হবে। এ কাজ সহজসাধ্য নয়। সমাজ-তন্ত্রবাদকে যে আমাদের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছি তার কারণ শুধু এই নয় যে আমরা তাকে ঠিক ও কল্যাণকর ব'লে মনে করি, তার কারণ আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের অন্য কোনো পথ নেই। মাঝে মাঝে এমন কথা বলা হয় যে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং হুকুমশাহী এবং জবরদস্তির

পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এ কথা আমি মানি না। বস্তুত আজ ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বর্জনের যে কোনো চেষ্টা বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবে এবং অগ্রগতির সমস্ত আশু সম্ভাবনাকে নষ্ট করবে। দূর ভবিষ্যতের দিক থেকেও আমি ব্যক্তির মর্যাদায় এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, যদিও জটিল সমাজে এ স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, পাছে তা অন্যের অনিষ্ট করে।

যে বিরাট কাজ আমরা হাতে নিয়েছি তার জন্যে প্রয়োজন দেশের জনগণের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা। এ সহযোগিতা পেতে হলে তাদের সামনে এমন লক্ষ্য ধরতে হবে যা তারা গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে করে এবং যা তাদের কাছে ফলপ্রদ বোধ হয়। যে পরিবর্তন আমরা চাইছি তা ঘটাতে হলে আমাদের জনসাধারণের উপর ভার না চেপে পারে না, এমনকি ভারবহনের ক্ষমতা যাদের সব চেয়ে কম তাদের উপরও। যদি তারা উপলব্ধি না করে যে এমন এক সমাজ গ'ড়ে তুলবার কাজে তারা অংশীদার যে-সমাজ তাদের উপকার করবে তাহলে এই ভার তারা গ্রহণ করবে না কিংবা তাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। যাকে বলা হয় "নির্বাধ উদ্যোগ" (free enterprise) তা আমাদের জনগণকে কখনও আকৃষ্ট করবে না; তাতে আমাদের শক্তি ও সঙ্গতি অনেক সময় এমন সব উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে যার গুরুত্ব অনেক কম। তার অর্থ হবে মুনাফা প্রবৃত্তিকে কাজে লাগানো। তাতে হয়তো ব্যক্তির স্বার্থ থাকতে পারে, কিন্তু সমাজের নয়।

আজকের পৃথিবীতে সব চেয়ে শক্তিশালী প্রেরণা হল সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যবোধ। পুরনো সামন্ত-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল জমির উপর অল্পসংখ্যকের মালিকানা এবং অন্যদের কোনো রকমে বেঁচে থাকা। আজ সে ব্যবস্থা কেউ সমর্থন করে না। সেই রকম, প্রচলিত অনেক ব্যবস্থারই এখন আর কোনো প্রভাব নেই; সেগুলি হয় জনসাধারণের চিন্তার সঙ্গে, নয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খায় না।

১৫

যে ধরনের কাজ আমাদের সামনে, তাতে সুপরিকল্পিত ও বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে অগ্রসর হওয়া একান্ত প্রয়োজন, যাতে আমরা আমাদের সঙ্গতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি এবং জাতির কর্ম-প্রচেষ্টাকে আমাদের লক্ষ্যের দিকে চালিত করতে পারি। আশ্চর্যের ব্যাপার এই বিজ্ঞানের যুগে এখনও মুনাফাশিকারী এমন কিছু লোক রয়েছে যারা ব্যক্তিগত কারবারের এলোমেলো পদ্ধতিতে বিশ্বাসী।

আমরা আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাঝামাঝি এসে গেছি। আমাদের সামনে রয়েছে তৃতীয় পরিকল্পনা। এমন এক পর্যায়ে আমরা পৌঁচেছি যেখানে এই পরিকল্পনাই পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট ক'রে দেবে কোন্ কোন্ বাস্তব লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছতে হবে এবং কি উপায়ে আমরা পৌঁছব। পার্লামেণ্টে আমাদের রাষ্ট্রপতির ভাষণের পুনরুক্তি ক'রে বলি, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষাশেষি "আমাদের মূল শ্রমশিল্প, কৃষি-উৎপাদন এবং পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির এক দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং তার দ্বারা আমরা আত্মনির্ভর ও সৃজনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পৌঁছব।" তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হওয়ার সঙ্গেই আমাদের সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এ প্রত্যাশা আমরা করি না, তার পরেও অনেক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আসবে কিন্তু আমাদের নিশ্চিত লক্ষ্য দারিদ্র্যের প্রাকার চূর্ণ করা, যাতে আমাদের অনুন্নত অবস্থা চিরস্থায়ী না হতে পারে। যদি তাতে আমরা কৃতকার্য হই—আমি বিশ্বাস করি হব—তাহলে আমরা আরও দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে যাব এবং অন্যের উপর আরও কম নির্ভর করব। এর জন্যে ভারী বোঝা আমাদের কাঁধে চাপবে। কিন্তু যদি আমরা সত্যই আমাদের লক্ষ্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে কৃতসংকল্প হয়ে থাকি তাহলে এ বোঝা কোনোমতেই এড়ানো চলে না।

গত কয়েক মাসের মধ্যে জমি সম্পর্কে কতকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যার জন্যে কিছু কিছু সমালোচনা হচ্ছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই শ্রেণী-বিরোধ। যে কোনো বড় সামাজিক পরিবর্তনের সময়ে এ বিরোধ অনিবার্য। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত

যে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে এ বিরোধেরও মীমাংসা আমরা করব, যেমন ইতিপূর্বে এ ধরনের অন্য বিরোধের ক্ষেত্রে করেছি।

আমি নিঃসন্দেহ যে, আমাদের পল্লীবাসীদের পক্ষে সমবায় ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তাদের জন্যে বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান একান্ত আবশ্যক এবং এগুলির শেষ পর্যন্ত সমবায় কৃষি-সংস্থায় পরিণত হওয়া উচিত। বর্তমান অবস্থায় যৌথ কৃষি-সংস্থা ভারতবর্ষের উপযোগী ব'লে আমি মনে করি না এবং আমি চাই না আমাদের কৃষকরা একটা যন্ত্রের অংশ হয়ে একাকার হয়ে যাক। আমাদের মনে রাখতে হবে এ দেশের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং তুলনায় জমির পরিমাণ অতি অল্প। এই সব প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক যে উঠেছে শুধু এ থেকেই বোঝা যায় যে অগ্রগতি হচ্ছে এবং অর্থনীতির ব্যাপারে আমরা যুগ যুগান্তের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসছি!

কোনো তত্ত্ব দ্বারা, তা সে যত ভালোই হোক, আমরা আমাদের কৃষিজীবী জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে পারব না। আসল কর্তব্য হবে তাদের বোঝানো, সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের আত্ম-নির্ভরতা জাগ্রত করা। এই কারণে গ্রাম-পঞ্চায়েৎ এবং পল্লী-সমবায়ের এত গুরুত্ব। তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে, এই যুক্তির কিছু সারবত্তা হয়তো আছে, কিন্তু প্রকৃত কোনো সিদ্ধতা নেই। ঝুঁকি নিতেই হবে, কারণ একমাত্র সেইভাবেই জনসাধারণ পরীক্ষা ও ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে শিক্ষালাভ করবে।

সাড়ে ছ'বছর আগে ভারতবর্ষে কমিউনিটি ডিভেলাপমেণ্ট আন্দোলন আরম্ভ হয়। এখন তিন লক্ষ গ্রাম তার আওতায়। এ এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। আমি মনে করি দেশের মধ্যে এর ফল বৈপ্লবিক হবে, এবং কতক পরিমাণে হচ্ছেও। এর অসাফল্যের দিকটা আমার অজানা নয়, কিন্তু সাফল্য তো আরও প্রত্যক্ষ। জনসাধারণ এর সঙ্গে কতখানি সহযোগিতা করছে তার উপর নির্ভর করে সার্থক ফল। কর্মচারী এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের গুরুত্ব আছে ঠিকই, কিন্তু আসল ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে সাধারণ কৃষককে। আমি মনে করি কমিউনিটি ডিভেলাপমেণ্ট পরিচালনার ফলে গ্রামাঞ্চলে এক নতুন মনোভাব ছড়িয়ে পড়ছে।

জমিতেই হোক বা শ্রমশিল্পেই হোক বা সরকারী শাসনযন্ত্রেই হোক, কাজের পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মুনাফা-প্রেরণার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন আহরণশীল সমাজ যে সব মূল্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাদের জায়গায় আসবে নতুন সব মূল্য। সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে সময় লাগবে, কারণ আমাদের সামনে সমস্যাটা হল কোটি কোটি মানুষের চিন্তা ও কর্মকে তাদের সম্মতি নিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে বদলে দেওয়া। কিন্তু পরিবর্তনের গতিকে যে মন্থর হতেই হবে এমন কোন কথা নেই, বস্তুত অবস্থার কারণেই আমাদের খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

১৬

ভারতবর্ষের চিত্র আজ অতি বিমিশ্র—একদিকে আশা অন্যদিকে যন্ত্রণা, একদিকে আশ্চর্য অগ্রগতি অন্যদিকে জড়তা, একদিকে নতুন উদ্দীপনা অন্যদিকে অতীতের সুবিধাভোগের মৃত হিমস্পর্শ, একদিকে বিকাশমান সর্বাঙ্গীণ ঐক্য অন্যদিকে বিভেদ-বিশৃঙ্খলার দৃশ্য। সব নিয়ে জনসাধারণের মনে ও কর্মে এক প্রবল জীবনী-শক্তি ও চাঞ্চল্য। আমরা যারা এই নিত্য পরিবর্তমান দৃশ্যের মাঝখানে রয়েছি, সব সময়ে প্রত্যক্ষ ঘটনার পূর্ণ তাৎপর্য সম্ভবত আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না। এ পরিস্থিতিকে সাধারণত বিদেশীরাই ভালো উপলব্ধি করতে পারেন।

এ এক অসাধারণ ঘটনা, যে দেশ ও জাতি সুদূর অতীতে বদ্ধমূল এবং ইতিপূর্বে পরিবর্তনকে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করেছে, সেই দেশ ও জাতি এখন দৃঢ় পদক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমরা ভারতবর্ষে ইতিহাস সৃষ্টি করছি। সে সম্বন্ধে হয়তো আমরা সচেতন নই, কিন্তু তবু ইতিহাস আমরা সৃষ্টি করছি।

বর্তমানের শ্রম ও চাঞ্চল্য থেকে কি সৃষ্টি হবে? আগামীকালের ভারতবর্ষ কি রকম হবে আমি বলতে পারি না। আমি শুধু আমার আশা ও কামনা ব্যক্ত করতে পারি। স্বভাবতই আমি চাই, ভারতবর্ষ বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি করুক, তার বিশাল জনসমষ্টির জীবনযাত্রার মান

উন্নয়নের জন্যে তার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিষ্পন্ন করুক। আমি চাই, ধর্ম বা বর্ণ, ভাষা বা প্রদেশের নামে আজকের এই সব সংকীর্ণ বিরোধ অন্তর্হিত হোক এবং এক শ্রেণীহীন বর্ণভেদহীন সমাজ গড়ে উঠুক, যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে বিকাশলাভের সুযোগ পাবে। বিশেষভাবে আমি আশা করি, বর্ণের অভিসম্পাত নিশ্চিহ্ন হবে, কারণ বর্ণের ভিত্তিতে কি গণতন্ত্র কি সমাজতন্ত্র কোনোটাই সম্ভব নয়।

চারটি বিরাট ধর্ম ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছে। তার নিজের চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয় দুটি ঃ হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ; এবং দুটি আসে বিদেশ থেকে, কিন্তু ভারতবর্ষে তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম। বিজ্ঞান আজ ধর্মের প্রাচীন প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ধর্ম যদি যুক্তিনিরপেক্ষ অনড় মতামত এবং আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে না থেকে জীবনের উচ্চতর বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হয়, তাহলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের এবং এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিরোধ ঘটার কথা নয়। এই সমন্বয় সাধনে সাহায্য করবার অসামান্য সৌভাগ্য ভারতবর্ষের হতে পারে। সে কাজ হবে অশোক-লিপিতে উৎকীর্ণ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অনুসারী। অশোকের এই বাণী আমরা আজ স্মরণ করব ঃ

> "আত্মিক শক্তির বৃদ্ধি বহু প্রকারের।
>
> "কিন্তু মূল হল বাক্‌সংযম ঃ স্বধর্মের প্রশংসা এবং অন্য ধর্মের নিন্দা অথবা বিনা উপলক্ষে বা বিনা প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে লঘু মন্তব্য পরিহার করা।
>
> "উপযুক্ত উপলক্ষ দেখা দিলে অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদেরও যোগ্যভাবে সম্মানিত করা উচিত। যদি এইভাবে আচরণ করা যায় তাহলে স্বধর্মকে অধিকতর মর্যাদা দান করা হয় এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও সাহায্য করা হয়। এর বিপরীত আচরণ যদি করা হয় তাহলে স্বধর্মের অনিষ্ট করা হয় এবং অন্য ধর্মেরও অপকার করা হয়।
>
> "যে স্বধর্মকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু অপরকে তার স্বধর্মের প্রতি আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা করে এবং যে স্বধর্মকে

অন্য সকল ধর্মের চেয়ে বড় ব'লে প্রচার করে, সে নিশ্চিতভাবে তার স্বধর্মের অনিষ্ট করে।"

অশোকের কালে সমস্ত বিশ্বাস ও কর্তব্য ধর্মের অন্তর্গত ছিল। আজ আমরা ধর্ম নিয়ে তত কলহ করি না, কলহ করি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় এবং আদর্শ নিয়ে। কিন্তু রাজনীতি বা অর্থনীতিতে ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি আচরণে আমরা অশোকের উপদেশ অনুসরণ করতে পারি। অশোকের মনে ঠাণ্ডা-লড়াইয়ের কোন স্থান ছিল না, আজও তার কোনো স্থান না থাকাই উচিত।

আজকের চেষ্টায় আমরা যে রকম গড়ব আগামী কালের ভারতবর্ষ সেই রূপ নেবে। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ভারতবর্ষ শ্রমশিল্পে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে যাবে; বিজ্ঞানে ও টেক্‌নলজিতে সে উন্নত হবে; আমাদের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উঁচু হবে, শিক্ষা বিস্তার লাভ করবে, স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও ভালো হবে এবং শিল্প ও সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করবে। আমরা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নির্ভীক হৃদয়ে এই তীর্থ-যাত্রায় বেরিয়েছি, যাত্রা যতই দীর্ঘ হোক লক্ষ্যস্থলে আমরা নিশ্চয়ই পৌঁছব।

কিন্তু আমার চিন্তা শুধু আমাদের বৈষয়িক অগ্রগতি নিয়েই নয়, আমাদের জনসাধারণের চরিত্রের গুণ ও গভীরতার কথাও আমি ভাবি। শিল্প-প্রগতির দ্বারা ক্ষমতা আহরণ ক'রে তারা কি ব্যক্তিগত ধনসম্পদের অন্বেষায় এবং আরামের জীবনযাপনে নিজেদের হারিয়ে ফেলবে? তা এক মর্মান্তিক ব্যাপার হবে। কারণ তার দ্বারা ভারতবর্ষকেই অস্বীকার করা হবে, ভারতবর্ষ অতীতে এবং আমি মনে করি গান্ধীজীর জীবনের মাধ্যমে বর্তমানেও যা প্রচার ও সমর্থন করেছে তাকেই নস্যাৎ করা হবে। শক্তি প্রয়োজন, কিন্তু বিজ্ঞতা আরও প্রয়োজন। বিজ্ঞতা ও শক্তির সমন্বয়ই একমাত্র কল্যাণকর।

আজকাল আমরা সকলেই অধিকার ও সুবিধার কথা বলি এবং তা দাবী করি। কিন্তু প্রাচীন ধর্মের শিক্ষা ছিল কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে। কর্তব্য সম্পাদন করলেই তবে অধিকার জন্মায়।

আমরা কি অন্তরের এই প্রগতির সঙ্গে বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির

প্রগতিকে সংযুক্ত করতে পারব? আমরা বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠাহীন হতে পারি না, কারণ বিজ্ঞান বর্তমান জীবনের মূল বাস্তব সত্যের প্রতিভূ। কিন্তু যুগ যুগ ধ'রে ভারতবর্ষ যে মৌল নীতি সমর্থন ক'রে এসেছে তার প্রতি নিষ্ঠাহীন হওয়া আমাদের আরও অনুচিত। অতএব আমরা যেন আমাদের সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিয়ে শিল্প-প্রগতির পথ অনুসরণ করি এবং সেই সঙ্গে যেন মনে রাখি যে, সহনশীলতা, করুণা ও বিজ্ঞতা ছাড়া বৈষয়িক সম্পদ ধূলি ও ভস্মে পরিণত হতে পারে। আমরা এ কথাও যেন মনে রাখি যে "শান্তি স্থাপন যারা করে তারা ধন্য।"

মওলানা আবুল কালাম আজাদের সম্মানার্থে নতুন দিল্লীর "ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচার্যাল রিলেশন্স্"এর ব্যবস্থাপনায় যে, আজাদ বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়েছে, তার উদ্বোধনী ভাষণ হিসেবে দেশবরেণ্য নেতা, প্রখ্যাত পণ্ডিত, মনীষী ও মানবপ্রেমিক প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যে অনিন্দ্যসুন্দর বক্তৃতাটি দেন, তার শিরোনাম হ'ল, 'ইণ্ডিয়া টু-ডে অ্যাণ্ড টুমরো'; এই বক্তৃতাটির একটি 'বিশিষ্ট মূল্য এবং গুরুত্ব রয়েছে, শুধুমাত্র ভারতবাসীদের কাছেই নয়, যে ভারতবাসীদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন নতুন যুগের আবেদনকে স্বীকার করে নিতে, বক্তৃতাটি সমস্ত পৃথিবীর সংবেদনশীল নারী ও পুরুষদের কাছেও খুবই আকর্ষণীয় ব'লে প্রতীয়মান হবে।' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিন্তাশীল রাজনৈতিক নেতাদের অন্যতম, অসাধারণ প্রজ্ঞাবান মনীষী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুলেখক ও চিরদিনের একনিষ্ঠ কর্মী শ্রীনেহরু তাঁর এই বক্তৃতার মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অনুভূতির অপূর্ব সম্মেলন ঘটিয়েছেন। পৃথিবীর চারদিকে দিনের পর দিন অশান্তি, উদ্বেগ ও বিক্ষোভ যখন বেড়ে যাচ্ছে, এবং সব দেশেই যখন বিরোধী ভাবধারাগুলো ক্রিয়াশীল হয়ে উঠ্‌ছে, সেই পরিস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রী স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও উদার দৃষ্টির দ্বারা এবং সহনশীলতা ও ধৈর্যের দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাঁর অভিমত হ'ল আজকের দিনে শ্রমের দ্বারা আমরা যা করতে পারি তারই পরিণত ফল হ'ল কালকের ভারতবর্ষ।' আর এমনি ধৈর্যশীল ও দৃঢ় ভাষণের দ্বারা তিনি পরম সার্থকতা লাভের ইঙ্গিত জানিয়েছেন।